৫৭-৫৮ দুই খণ্ড একত্রে

বাংলাপিডিএফ

স্বাধীন বাংলায় দস্যু বনহুর
পাকিস্তানে দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

রুমি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

স্বাধীন বাংলায় দস্যু বনহুর-৫৭
পাকিস্তানে দস্যু বনহুর-৫৮

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

হলুদ খালি ঘাঁটি।

মুক্তি বাহিনী জোয়ানগণ বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের হাসান ভাই এর। আজ সে ফিরে আসবে তাদের মধ্যে।

হলুদ খালি ঘাঁটি সাজানো হয়েছে গাছ-পালা আর ফুল পাতা দিয়ে। মুক্তি যোদ্ধা তরুণদের হাতে হাতে মালা ঝুলছে। শুধু আজ নয় কয়েকদিন হলো তারা তাদের ক্যাপ্টেন হাসেনের জন্য প্রতিক্ষা করছে। আজ তাদের প্রতিক্ষা স্বার্থক হবে।

এক সময় একজন মুক্তি যোদ্ধা তরুণ আনন্দ ধ্বনি করে ছুটে এলো—হাসান ভাই এসেছে...হাসান ভাই এসেছে...সবাই হাসানকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলো।

হাসান এসে দাঁড়ালো মুক্তি বাহিনীর ছেলেদের মধ্যে। হাস্যউজ্জ্বল দীপ্ত মুখখানা আজ অপূর্ব সুন্দর লাগছে।

মুক্তি যোদ্ধা বীর তরুণরা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। হাসান সকলের সঙ্গে করমর্দন করে। যদিও মুক্তি যোদ্ধাগণ সবাই জানে ক্যাপ্টেন হাসান এতোদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো কিন্তু সে কোথায় কি ভাবে ছিল জানার জন্য সবাই ব্যাকুল। হাসান বুঝতে পারে মুক্তি যোদ্ধা তরুণদের মনোভাব। সে প্রথমে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায়, সবাইকে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তারপর বলে—আজ আমরা বহু ত্যাগ তিতিক্ষার পর দেশকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। শত্রু আজ পরাজিত, বাংলার মানুষ আজ জয়ী। সত্যি আজ-বড় আনন্দের দিন, বড় খুশির দিন কিন্তু এ আনন্দ আমরা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছি না কারণ খান সেনাগণ বাংলাকে একেবারে অন্তঃসার শূন্য করে রেখে গেছে। সোনার বাংলা এখন একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, অসহায় সম্বলহীন।

মুক্তি যোদ্ধা তরুণগণ সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো—তাদের হাসান ভাই-এর কথা।

হাসান তখন বলে চলেছে—বাংলার এই স্বাধীনতায় বহু মা হারিয়েছেন তার সন্তানকে, বহু ভগ্নী হারিয়েছে তাদের ভাইকে। বহু স্ত্রী হারিয়েছেন

তাদের প্রিয়তম স্বামীকে। কোন দেশের স্বাধীনতায় এতো রক্ত ক্ষয় হয়নি, যত রক্ত ক্ষয় হয়েছে বাংলার স্বাধীনতা আনতে। বাংলার এমন কোন পরিবার নাই যে পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। প্রত্যেকটা পরিবারকে দিতে হয়েছে ত্যাগ-দিতে হয়েছে রক্ত। গত দীর্ঘ নয়টি মাস বাংলার বুকে খান সেনারা যে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ছিলো কোন ইতিহাসে তার নজির নাই। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বেয়োনটের আঘতে বিদ্ধ করেছে। মায়ের উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার।

থামলো বনহুর মুখমণ্ডল তার রাগে ক্ষেভে রক্তের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। অধর দংশন করে বললো সে—বাংলার প্রায় দু'লক্ষ নারীর ইজ্জৎ তারা লুটে নিয়েছে। আজ সে সব নারী, সে সব মা বোনদের অনেকেই এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া বিসর্জন দিয়ে চির বিদায় নিয়েছে, আত্মহত্যা করে তারা নিজেদের অভিশপ্ত জীবন শেষ করে দিয়েছে। যারা আছে তারা এখন সমাজে নিজেদের হেয় ঘৃণ্য মনে করে বেঁচে আছে কারণ অনেকেই খান সেনা বাহিনীর দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা।

বনহুর রুমাল দিয়ে মুখ খানা মুছে নিলো, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এই সব মা বোনদের সমাজে সসম্মানে স্থান দেওয়া। কারণ এরা বাংলার স্বাধীনতায় সব চেয়ে বেশি এবং বড় আত্মত্যাগ দিয়েছেন। একটি অনুরোধ আমি করবো তোমাদের কাছে। তোমরা যারা বিবাহ যোগ্য তারা এই সব বোনদের গ্রহণ করতে কোন সময় দ্বিধা বোধ করবে না। এদের বরণ করে তুলে নেবে ঘরে, ঘরের লক্ষী হিসাবে। দেখবে সমাজ আর সমাজ পতিদের মুখ কালো হয়ে যাবে, তারা শিক্ষা পাবে তোমাদের কাছে। বলো তোমরা রাজি আছো আমার প্রস্তাবে?

সবাই নীরব। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি যোদ্ধা তরুণরা।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে আবার—ভেবে দেখো এরা তোমাদেরী বোন। তুমি যদি আর জনের বোনকে সচ্ছমন নিয়ে গ্রহণ করো তা হলে তোমার বোনকেও আর একজন গ্রহণ করবে সানন্দে। তোমরা প্রত্যেকেই যদি এসব লাঞ্ছিতা নির্যাতীতা মহিলাদের সমাজে তুলে নাও তাহলে আমাদের সমাজ হবে নতুন এক সৃষ্টি। বলো তোমরা পারবে এদের গ্রহণ করতে?

এবার মুক্তি বাহিনীর তরুণরা বলে উঠে— পারবো।

সাবাস। তোমরা বাংলা মায়ের আদর্শ সন্তান। হা যুদ্ধ আমাদের শেষ হয়েছে কিন্তু সংগ্রাম আমাদের শেষ হয়নি। দুই শত বছর ইংরেজের গোলামীর পর আমরা পেয়েছিলাম পাকিস্তান, ভেবেছিলাম আমরা এবার মানুষের মত বাঁচতে পারবো; এতো বেশি কিছু আমরা আশা করে ছিলাম না, দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাবো। পরার বস্ত্র জুটবে। স্বাধীনভাবে পথ চলতে পারবো, সচ্ছভাবে কথা বলতে পারবো, কিন্তু কি পেয়েছিলাম আমরা'! বাংলার মানুষ কি পেটপুরে খেতে পেয়েছে, তারা কি লজ্জা নিবারণের জন্য পেয়েছিলো বস্ত্র? পায়নি, যা পেয়েছিলো তা তাদের জন্য যত সামান্য মাত্র। বাংলার মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে রৌদ্রে পুড়ে যে ফসল উৎপাদন করেছে তা তারা ভোগ করতে পারেনি? ভোগ করেছে যাঁরা তাঁরা হলেন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি। ইংরেজের পরিবর্তে এলো পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠি। শুধু হাত বদল হলো মাত্র। আবার চললো শোষণ আর শাসন সোনার বাংলার বুকে যে সোনার ফসল জন্মে তার তিন ভাগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে আর এক ভাগ থাকে বাংলার মানুষের জন্য। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি দিন দিন ফেঁপে উঠতে লাগলো, যেমন আংগুল ফুলে কলা গাছ হয়। বাংলার মানুষ এতো পরিশ্রম করেও পেট পুরে দু'বেলা দু'মঠো খেতে পায়নি, পায়নি তারা মাথা-গুঁজে থাকার আশ্রয়। বাংলার যারা আসল সন্তান তারা কুঁড়ে ঘরে রোদ বৃষ্টিতে ভিজে কোন রকমে জীবন ধারণ করেছে আর একদল পুঁজি পতি তাদেরই বুকের রক্তে ফলানো ফসলের অর্থে সুউচ্চ অট্টালিকায় বৈদ্যুতিক হাওয়ায় বেহেস্তের শান্তি উপভোগ করে চলেছে। শুধু তাই নয় যারা দেহের রক্ত উজার করে হাড় গুড়ো করে জমিতে ফসল ফলিয়েছে তারাই খেতে পায়নি, ধুকে ধুকে মরেছে ক্ষুধায়। অসুখে ভুগেছে এক ফোঁটা ঔষধ জোটেনি অথচ সেই সব পুঁজি পতি আর পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির ঘরে ঘরে উৎসব আর পার্টির ছড়া ছড়ি। তাদের ভোজের আয়োজনে ব্যয় হয় হাজার হাজার টাকা। আর এক মুঠি অন্নের জন্য মাথা কুটে মরে বাংলার মানুষ। অন্যায় অবিচার কোন দিন স্থায়ী হয়না; হতে পারে না। তাই বাংলার মানুষ উঠলো ক্ষেপে, তারা আর নীরবে শোষণ আর শাসন মানতে রাজি নয়। বাংলার মানুষের ধমনির রক্তে আগুন জলে উঠলো প্রতিবাদ করলো তারা। তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। দীর্ঘ চব্বিশ বছর তারা পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শাসন মেনে এসেছে। ভেবেছিলো একদিন তাদের সুদিন আসবে হয়তো তারা পাবে বাঁচার অধিকার। কিন্তু তা

পায়নি আর পায়নি বলেই তারা ক্ষেপে গেলো। শুরু হলো সংগ্রাম থামলো বনহুরের মুখমণ্ডলে মুক্তা বিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছিলো, প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল খানা বের করে মুখের ঘাম মুছে নিলো তারপর বললো—প্রচুর রক্ত ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের শেষ হয়েছে এবার আর একটি সংগ্রাম সে সংগ্রাম হলো এই বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার সংগ্রাম। সোনার বাংলা যেন সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হয় এখন তোমাদের সকলের সেই দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষ যেন আদর্শভাবে নিজেদের পরিচালিত করে, তাহলে দেশ ও একটি আদর্শ সার্বভৌম দেশ হিসাবে গড়ে উঠবে। তখন আমাদের রক্ত দান হবে স্বার্থক। বনহুর এবার বাংলার বীর সন্তান মুক্তি যোদ্ধাদের কয়েক জনের নাম ধরে বললো—

—হীরা, রুস্তম, মাহবুব, হামিদ, কাসেম, খালেক, মাসুদ, মহসীন তোমরা এবার তোমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাও। তোমাদের পড়াশুনায় মনোযোগ দাও এবং লেখাপড়ার মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজ করে যাও। হাঁ এখনও বাংলার মানুষের মধ্যে অনেক অমানুষ লুকিয়ে আছে, যারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। তারা যাতে আর ছোবল মারার সুযোগ না পায় সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

বনহুর থামলো, বললো আবার—তোমরা শপথ নাও দেশ গড়ার কাজে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন বঙ্গ বন্ধুর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুর উপর।

সবই এক সঙ্গে বলে উঠলো—শপথ নিলাম দেশ গড়ার কাজে আমরা আত্মদান করবো যেমন আত্মাহুতি দিয়েছি বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে।

সাবাস। তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তোমরা যদি আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠো তা হলে সোনার বাংলা পৃথিবীর মধ্যে এক মহান দেশ হিসাবে পরিচিত হবে। আজ তাহলে এখানেই—

সবাই বলে উঠে—না আমরা আরও কিছু শুনতে চাই হাসান ভাই। আমরা জানতে চাই, আপনি এতোদিন কোথায় কোন কজে ব্যস্ত ছিলেন।

বনহুর একটু হাসলো তারপর আনমনে কি যেন ভাবলো—হাঁ বলবো সব বলবো তোমাদের কাছে। সেদিন তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম সোজা পশ্চিম বাংলায়। দেখলাম ভারত জননী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা দেশের শত্রু পশ্চিমা হানাদারদের সায়েস্তা করার জন্য তাদের বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমিও বিমান বাহিনীর দলে যোগ

দিলাম। অবশ্য এ জন্য আমাকে অনেক চেষ্টা নিতে হয়েছে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিমান চালনা আমি পূর্ব হতেই জানতাম। এর পূর্বেও আমাকে একবার বিমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। হাঁ সে জন্যই আমার কোন অসুবিধা হলো না।

মুক্তি যোদ্ধাগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে তাদের হাসান ভাই-এর মুখের দিকে। অবাক হয়ে শুনছে তার কথাগুলো। হাসান ভাই বিমান চালনা করতে পারে কম কথা নয়।

বনহুর বলে চলেছে—ভারতীয় বিমান চালকদের সঙ্গে আমিও বোমারু বিমান নিয়ে বাংলার আকাশে ফিরে এলাম। তারপর চললো বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য ছিলো হানাদারদের ধ্বংস করা। খান সেনা বাহিনীর অস্ত্রসস্ত্র গোলা বারুদ এবং তাদের শিবির। আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি প্রত্যেকটা শত্রু শিবির আমরা বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি। বিধ্বস্ত করেছি আমরা তাদের সব অস্ত্র আর গোলা বারুদ। খান সেনাবাহিনী যখন বুঝতে পারলো তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন তারা বাংলার মেরুদণ্ড ভেংগে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো কারফিউ আর ব্লাক আউট দিয়ে শুরু করলো বাংলার বুদ্ধিজীবি হত্যা। ওরা ভেবেছিলো পরাজয়ের আগে বাংলাকে সম্পূর্ণ-বিকলাঙ্গ করে যাবে এবং সেই উদেশ্যেই তারা এ কাজে মেতে উঠলো। জল্লাদ ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর অধিনায়কগণের মাথা দিয়েই এ বুদ্ধি বেরিয়ে এসেছিলো সেদিন। বাংলার মানুষই সেদিন ওদের সহায়তায় এগিয়ে গিয়েছিলো—যাদের বলা হয় বদর বাহিনী আর রাজাকার! এরাই হলো বাংলার কলঙ্ক যাদের সাহায্যে চলেছিলো সেদিন বাংলার অমূল্য সম্পদ বুদ্ধিজীবি হত্যা যজ্ঞ।

রাগে ক্ষোভে বনহুরের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। অধর দংশন করে নিজকে স্বাভাবিক করে নিলো সে তারপর আবার বলতে শুরু করলো—এই সব আল-বদর আর আল-শামস ও রাজাকারগণ যদি খান সেনা বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে না যেতো তা হলে বাংলা আজ এমন ভাবে অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়তো না। নিধন হতো না বাংলার মানুষ। এই সব বদর বাহিনী ও রাজাকাররা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে খান সেনা বাহিনীকে গ্রাম হতে গ্রামে চালিয়েছে হত্যালীলা আর অগ্নিকাণ্ড। আর চালিয়েছে বাংলার মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার। পাপ কোনদিন স্থায়ী হয় না তাই খান সেনা বাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনার মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তারা পরাজয়ের গ্লানি

ললাটে মেখেছে। একটু থেমে পুনঃরায় বলতে শুরু করলো বনহুর—আজ বাংলা স্বাধীন হয়েছে কিন্তু একেবারে শত্রুমুক্ত হয়নি। বাংলার মাটিতে এখনও অনেক আলবদর আর রাজাকার সভ্য মানুষের মধ্যে ভদ্র মানুষের মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঁ এবার খুঁজে বের করতে হবে সেই সব দালাল আর দুস্কৃতি কারীদের।

সেদিনের মত বক্তব্য শেষ করে বনহুর।

সভা ভঙ্গ হয় এবার।

মুক্তি যোদ্ধা গণ এর পর হাসান ভাইকে নিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। আজ তারা স্বাধীন বাংলার মানুষ এটাই তাদের বড় খুশি।

❑

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় শামীমার। ধর্ ফর্ করে বিছানায় উঠে বসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে। এ শব্দটা কিসের। একটু পরেই বুঝতে পারে কেউ তাদের সদর দরজায় টোকা দিচ্ছে। শব্দটা মৃদু হলেও বেশ স্পষ্ট। শামীমার এ শব্দ পরিচিত কারণ প্রায় রাতেই এ ধরণের শব্দ সে শুনে এসেছে এবং জানে সে এ শব্দ কারা করেছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক দুস্কতিকারী এই বাংলার বুকেই আত্নগোপন করে আছে। তার বড় ভাই রিয়াজ আলী একজন বদর বাহিনীর লোক। হানাদারদের সময় সে খান সেনা বাহিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য করে এসেছে। বহু গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বহু অসহায়া নারীর ইজ্জৎ বিনষ্ট হয়েছে। শামীমা এসব দেখেছে, প্রতিবাদ করেছে সে জন্য তাকে অনেক কষ্টও ভোগ করতে হয়েছে।

শামীমার বাবা ছিলেন হাজী মোহসীন আলী। তিনি ভাল লোক ছিলেন। তার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে রিয়াজ আলী আর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শামীমা আর সিমু। রিয়াজ আলীর মা মারা যাবার পর শামীমার মাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।

শামীমা আর শিমু জন্ম হইবার পর হাজী সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও জান্নাতবাসী হলেন। হাজী সাহেব একেবারে ভেংগে পড়লেন। নানা চিন্তা ভাবনায় তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনিও মারা গেলেন।

রিয়াজ আলী তখন বেশ বড়। সংসার সম্বন্ধে তর তখন জ্ঞান হয়েছে। শামীমা আর শিমু ছোট। রিয়াজ আলীর মাথায় সংসার চেপে বসলো। এতে সে হাঁপিয়ে না পড়ে খুশিই হলো বেশি। কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার মাতব্বরের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলো ঘরে। রিয়াজের বৌ এসে প্রথমেই শামীমা আর শিমুকে বিষ নজরে দেখলো।

এরপর থেকে শামীমা আর সিমুর জীবন এ সংসারে বড় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগলো। এতো অসহায় অবস্থার মধ্যেও শামীমা গ্রাম্য হাই স্কুল থেকে ভালভাবে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলো। ছোট ভাই সিমু এখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

বর্বর পশ্চিমা হানাদারগণ যখন বাংলার বুকে হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছিলো তখন শামীমার হৃদয় পশ্চিমা হানাদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিদ্বেষে ভরে উঠেছিলো আরো ঘৃণা এসেছিলো তার মনে, যখন তার বড় ভাই রিয়াজ আলী পশ্চিমা হানাদারদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিলো। তাদের গ্রামের আশে পাশের গ্রামগুলিতে তার ভাই রিয়াজ আলীর সহায়তায় যখন খান সেনা বাহিনী চালিয়েছিলো ধ্বংস যজ্ঞ। বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে ওরা, বহু নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার।

শামীমা প্রতিবাদ করেছিলো ভাই-এর কাছে, কিন্তু তার জন্য তাকে পেতে হয়েছে অনেক লাঞ্ছনা অনেক যাতনা। এমন কি খান সেনাবাহিনীর হাতে তাকে তুলে দেবার কথাও বলে শাসিয়ে ছিলো রিয়াজ আলী।

শামীমা সেদিন ডুকরে কেঁদেছিলো, ভাই এর মুখে এমন অশোভন কথা শুনবে ভাবতে পারেনি সে। সে তো তেমন কিছু বলেনি শুধু বলেছিলো—ভাইজান তুমি জ্ঞানী বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে কেনো দেশের এমন ক্ষতি করছো। বাংলাদেশের মানুষ তোমারই তো ভাই বোন। শামীমার কথা সেদিন শেষ হয়না ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলো রিয়াজ আলী—শামীমা মুখ সামলে কথা বলবি। লেখাপড়া শিখেছিস বলে বড় ভাইএর কাজের দোষ ধরবি এ আমি ভাবতে পারিনি।

সেদিনের পর থেকে অনেক কথাই তাকে নীরবে হজম করতে হয়েছে। অনেক কিছু চোখে দেখেও কোন প্রতিবাদ সে করতে পারেনি, শুধু দেখেই গেছে শামীমা।

তার বড় ভাই রিয়াজ আলী প্রায়ই গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতীদের নিয়ে আসতো, তারপর তাদের চালান করতো শহরে খান সেনাবাহিনীর শিবিরে। যুবতীদের নিয়ে যাবার সময় তার বাবা মা'র কাছে বলা হতো এই তো ক'দিন পর তোমাদের মেয়েরা চলে আসবে সঙ্গে আনবে প্রচুর টাকা পয়সা। কিন্তু হায় কেউ আর ফিরে আসেনি।

সেই সব যুবতীদের বাবা মা প্রায়ই এসেছে রিয়াজ আলীর কাছে, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেছে বৈঠকখানার সামনে। বেলা গড়িয়ে গেছে তবু তাদের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়নি রিয়াজ আলীর হয়তো বা সেদিন ফিরে গেছে আবার এসেছে পরদিন, কই তাদের মেয়েরাতো ফিরে এলোনা।

যতই দিন গেছে আকুলভাবে মাথা ঠুকে রোদন করেছে তারা। রিয়াজ মিয়া শাসন করেছে এ ভাবে কাঁদলে খান সেনা বাহিনী তাদেরকে গুলি করবে। প্রাণের ভয়ে ফিরে গেছে তারা ললাটে করাঘাত করতে করতে।

তারপর শোনা গেছে সেই সব হতভাগীনী যুবতীদের কারো কারো রক্তাত মৃত দেহ পড়ে আছে কোন গর্তে বা পুকুরের পানিতে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়।

দু'একজন ফিরে এসেছিলো কিন্তু তাদের দিকে তাকানো যায়না এমন অবস্থা। শরীরের বহু অংশ খান সেনা বাহিনী কুকুরের মত কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। ফিরে এসে কেউ বা আত্মহত্যা করেছিলো কেউ বা উন্মাদিনীর মত বেঁচে আছে আজও। কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারা আজ অন্তঃসত্তা অবিবাহিতা যুবতীগণ আজ তারা মা হতে চলেছে।

এসব অসহায় নারীদের কথা স্মরণ করে শামীমা ব্যাথায় মুষড়ে পড়তো কিন্তু সে কোন কথা বলতে পারতো না কারণ তারই বড় ভাই যে এই সব অশোভনীয় কাজের সহায়ক। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, খান সেনারা পরাজয়ের কালিমা মুখে লেপন করেছে। শামীমা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে, ভেবেছ এবার থেকে দেশ পাপমুক্ত হলো।

শামীমাদের বাড়িতে বেটারী রেডিও ছিলো অতি গোপনে সে শুনতো স্বাধীন বাংলার সংবাদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের বজ্রকণ্ঠের বাণী তার হৃদয়ে আলোড়ন জাগাতো। ধমনির রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা হতো তার সেও ছুটে গিয়ে যোগ দেবে মুক্তিবাহিনী ছেলেদের সঙ্গে। বড় ভাল লাগতো তার ঐ গানগুলো, যে গান মুক্তি পাগল মানুষকে চঞ্চল করে তুলতো কিন্তু বড় সাবধানে তাকে শুনতে হতো হঠাৎ যদি বাড়ির কেউ জানতে পারে

তাহলে কোন উপায় থাকবেনা। হয়তো এজন্য শামীমাকে অনেক লাঞ্ছনা পোহাতে হবে। মিথ্যা নয় একদিন কেমন করে যেন টের পেয়ে গিয়েছিলো তার ভাবী সাহেবা, ব্যাপারটা বলে দিয়ে ছিলো সে রিয়াজ আলীর কাছে। রিয়াজ আলী কথাটা শুনে যেন বোমার মত ফেটে পড়েছিলো, তার বাড়িতে স্বাধীন বাংলার সংবাদ শোনা হয়। এতো বড় দুঃসাহস শামীমার। সেদিন থেকে টেনজিষ্টারটাও সরিয়ে ফেলেছিলো রিয়াজ আলম। শামীমা সংবাদ না শুনতে পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলো কিন্তু কি করবে কোন উপায় নাই তার। পাশের এক বাড়িতে একটা কমদামী টেনজিষ্টার ছিলো অতি গোপনে মাঝে মাঝে গিয়ে সে শুনে আসতো। যখন শামীমা শুনতো খান সেনা বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটছে তখন মন তার আনন্দে নেচে উঠতো। শামীমার বয়স কম হলেও সে সব বুঝতো খুশি হয়ে সে দু'হাত তুলে খোদার কাছে মোনাজাত করতো, হে দয়াময় রহমানুর রাহিম তুমি জানো তুমি সব বুঝ অন্যায় আর পাপকে তুমি ক্ষমা করোনা।

হয়তো শামীমার মোনাজাত আল্লাহ কবুল করছিলেন এবং অমনি আরও কত শত শত মানুষের করুণ মোনাজাত তিনি করেছিলেন যার জন্য অন্যায় আর পাপ স্থায়ী হলোনা। বাংলার মানুষের কাছে তার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

যেদিন পাকবাহিনীর অধিনায়কগণ আত্মসমর্পন করলো, যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, সেদিন শামীমা বড় খুশি হয়েছিল যদিও সেদিন তাদের বাড়িতে বয়ে গিয়েছিলো শোকের হাওয়া। রিয়াজ আলী একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলো সেদিন, কে যেন তার মুখে এক পোঁচ চুন কালি মাখিয়ে দিয়েছিলো।

ভাই-এর অবস্থা দেখে মনে মনে বড় খুশি হয়েছিলো শামীমা কিন্তু মুখে তাকে করুণ ভাব টেনে রাখতে হয়েছিলো। যদি রিয়াজ আলী জানতে পারে তাহলে তাকে বাড়ি হতে বের করে দেবে।

দেশ স্বাধীন হলো, শামীমা এবার বুক ভরে নিশ্বাস নিলো। যাক এবার তাহলে বাংলার মানুষ বাঁচলো। খান হানাদাররা আর তাহলে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষগুলোকে কুকুরের মত গুলি করে মারতে পারবেনা।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই শামীমা বুঝতে পারলো বাংলা স্বাধীন হলেও বাংলা অভিশাপ মুক্ত হয়নি। সোনার বাংলার শ্যামল মাটির বুকে

এখনও অসংখ্য কাল-কেউটে লুকিয়ে আছে। যারা শুধু দেশের শত্রু নয় দেশের অভিশাপ।

রিয়াজ আলীর মুখ চুন হলেও চোখের আগুন নেভেনি। প্রায় রাতেই তার কাছে কারা যেন আসে যায় গোপনে, কি সব কথাবার্তা হয়। আবার কোথায় যেন যায় তারা যাবার সময় রিয়াজ আলীও তাদের সঙ্গে যায়।

শামীমা অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছে ব্যাপারটা। যারা তার ভাই-এর কাছে আসে, তারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নয় কেমন যেন সব কথা বলে। লোকে বলে ওরা নাকি অবাঙ্গালী।

হলুদ খালির অদূরে এদের কলোনী। এখানে বহু অবাঙ্গালী বাস করে। গ্রামের এবং শহরের যারা দালাল শ্রেণীর লোক তারাও নাকি এখন মুক্তিবাহিনীর তরুণদের ভয়ে নিজ নিজ বাড়ি ঘর ছেড়ে এসব কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছে।

রিয়াজ আলী এখনও বাড়ি ছেড়ে কলোনীতে আশ্রয় না নিলেও সর্বক্ষণ কলোনীর অবাঙ্গালী আর দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। খান সেনা বাহিনীর সময় অবাঙ্গালী আর দালালরাই ছিলো সর্বে-সর্বা যথেচ্ছা চারণ করে নিতো তারা সর্বত্র। খান সেনা বাহিনীর দক্ষিণ হস্ত ছিলো এরা। বাংলা স্বাধীনতা লাভ করার পর এরা চুপছে গেছে ছেঁদা বেগুনের মত। কেটোর মত লুকিয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে। কিন্তু মনে ওদের জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন, সুযোগ পেলেই কেউটে সাপের মত ছোবল মারবে।

রিয়াজ আলীও চুপসে গেছে কিন্তু একেবারে ভেংগে পড়েনি, গোপনে সে অবাঙ্গালী আর দালালদের সঙ্গে যোগ রেখে চলেছে। কেমন করে বাঙ্গালীদের সায়েস্তা করা যায়, কেমন করে বাংলাদেশকে ধ্বংস করা যায়।

শামীমার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ায় মেঝেতে; ভাইয়ের গায়ে লেপটা ভাল ভাবে টেনে দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে দেখে সে। বাহিরটা বেশ অন্ধকার তবু শামীমা বুঝতে পারে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের গেটের দরজার কাছে। তাদেরই একজন মাঝে মাঝে দরজায় টোকা দিচ্ছে।

শামীমা রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে আজ আবার কি সংবাদ নিয়ে এসেছে ওরা।

একটু পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে তার ভাইজান রিয়াজ আলী? তার হাতে কোন আলো না থাকলেও তবু সে অন্ধকারেই লোক দু'জনাকে চিনতে পারে বলে মনে হলো? চাপা গলায় বললো—তোমরা এসেছো?

একটা কর্কশ অথচ চাপা কণ্ঠস্বর—হাঁ রিয়াজ সাহাব।

কি সংবাদ?

সংবাদ ভাল আছে। আজ এগারো আদমী লে আয়া।

এগারোজনকে এনেছো?

হাঁ। পূর্বের কণ্ঠস্বর।

রিয়াজ আলীর গলা—এদের কোথা থেকে আনা হলো?

পাঁচ আদমী খুলনা-ছে, চার আদমী ঢাকা-ছে দো আদমী রাজশাহী-ছে আনা হয়েছে সাহাব।

এরা কি সব বুদ্ধিজীবী মহলের লোক?

হাঁ, সব আদমী বুদ্ধিজীবি আছে।

খান সেনা বাহিনী এত বুদ্ধিজীবিদের খতম করেছে আবার এদের জীবিত রেখেছিলো কেনো?

এ লোকদের কাছে কই বাত নিকলে নে লিয়ে রাখা-থা। আভি এ লোকদের খতম করনে হোগা রিয়াজ সাহাব।

তবে আর দেরী কেনো এনেছো থকম করে দাও।

আপকো যানে হোগা।

হাঁ আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। যে ভাবে ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে ঠিক ঐ ভাবে এদের হত্যা করতে হবে। প্রথমে চোখগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ হাত পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তৃতীয়তঃ ওদের হৃদপিন্ড কেটে বের করে নিতে হবে।

অন্ধকারে কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে শামীমা শিউরে উঠলো। মানুষ এতো বড় হৃদয়হীন হতে পারে। শামীমা শুনেছিলো খান হানাদারগণ এ ভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। বাংলার শত শত অমূল্য প্রাণকে তারা সমূলে ধ্বংস করেছে কিন্তু এরা তো খান বাহিনী নয়, এরা বাংলারই মানুষ অথচ তারাও এতো বড় পাষন্ড। শুধু আজই নয় এর আগেও তার ভাই এমন কত নিরীহ মানুষকে গোপনে হত্যা করেছে। বদর বাহিনীর একজন সেরা দালাল রিয়াজ আলী। খান সেনা বাহিনীদের প্রধান প্রধান সহায়কদের মধ্যে সে একজন। শামীমার মন ঘৃণায় ভরে উঠে।

শামীমার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অন্ধকারে একজন রিয়াজ আলীকে লক্ষ্য করে বলে উঠে—আপ চলিয়ে না রিয়াজ সাহাব।

হাঁ আমি যাবো তোমরা একটু অপেক্ষা করো। কথাটা বলে ভিতরে চলে যায় রিয়াজ আলী।

শামীমা আর বিলম্ব করেনা·সে ফিরে যায় নিজের বিছানার পাশে। ঘুমন্ত ভাইটার শরীরে হাত বুলিয়ে একবার দেখে নেয় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে সে। মাথা যেন ঝিম ঝিম করতে থাকে শামীমার, বলে কি এখনো এরা গোপনে হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে। শুধু হত্যাই নয় যদের বন্দী করে আনা হচ্ছে বা রাখা হয়েছে তাদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম পাশবিক নির্যাতন। না না আর এদের হত্যার সুযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে এই সব হতভাগ্য বুদ্ধিজীবীদের।

কিন্তু কি করে এদের বাঁচানো যায়। হঠাৎ শামীমার মাথায় একটা খেয়াল এলো। তাদের বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে হলুদখালি বলে মুক্তি বাহিনীদের একটা ঘাঁটি আছে। শামীমা হলুদখালি ঘাঁটির ক্যাপ্টেন হাসানের অনেক কথা শুনেছে? তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের হলুদখালির মুক্তি যোদ্ধাগণ বীর বিক্রমে খান হানাদারদের সঙ্গে লড়েছে। অকাতরে প্রাণ দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সার্থক করে তুলেছে। হাসানের বীরত্বের কাহিনী শুনে শামীমার মন ওর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। আজ এই মুহূর্তে শামীমার মনে পড়ে হাসানের কথা। এই সব অসহায় বুদ্ধিজীবীদের বাঁচানোর একটা বিপুল আশা উকিয়ে দেয় তার মনে। কোন রকমে হলুদখালি ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারলে সে হাসানের সহায়তা কামনা করবে।

শামীমা উঠে দাঁড়ালো।

আঁচলখানা জড়িয়ে নিলো সে ভাল করে শরীরে তারপর বাড়ির পিছন দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো।

অন্ধকার রাত।

চারিদিক থেকে ভেসে আসছে ঝি-ঝি পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ। হীমধারা ঠাণ্ডা বাতাস বাইছে। শামীমা একরকম প্রায় ছুটেই চলেছে হলুদখালি ঘাঁটির দিকে। হলুদখালি সে গেছে কয়েকবার তাই পথ চিনতে ভুল হয়না শামীমার। অবশ্য মুক্তিবাহিনীদের ঘাঁটি কোথায় তা সে ভাল করে জানে না তবু তার সাহস আছে হলুদখালি পৌঁছতে পারলে যেমন করে হোক খুঁজে নেবে। কারণ শামীমা তার ছোট ভাই শিমুর মুখে শুনেছিলো হলুদখালির দক্ষিণ পাড়ার কোন এক জায়গায়।

শামীমার মনে আজ কোন ভয় নাই। একটা অসীম মনোবল তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

শামীমা এর পূর্বে কোনদিন রাতের অন্ধকারে এমনভাবে বাড়ির বাইর হয় নাই তবু একা নিঃসঙ্গ অবস্থায়। মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে হঠাৎ যদি কেউ তার পথ আগলে দাঁড়ায়, মনে মনে শিউরে উঠে শামীমা। কিন্তু পরক্ষণেই মন থেকে সব ভয় মুছে ফেলে ছুটতে থাকে।

হলুদখালি গ্রামের নিকটে পৌঁছে গেছে শামীমা। কোন এক বাড়ি থেকে কুপির আলো নজরে পড়ছে। কুকুরের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। সামনে কয়েকটা জমি পেরুলেই হলুদখালি।

শামীমার শরীর ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে যেন? হাওয়ার বেগ আরও বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। শামীমা-ঐ কুপির আলো লক্ষ্য করে দ্রুত পা চালিয়ে চলেছে। আঁচলখানা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে সে গায়ে।

হঠাৎ শামীমা চমকে উঠে—দু'জন লোক তার সম্মুখে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। অন্ধকারে লোক দুটোকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে।

শামীমা কম্পিত গলায় বলে উঠে—কে, কে তোমরা?

লোক দুটো হেসে উঠে, একজন বলে—এ্যাঁ মেয়ে লোক দেখছি.....

আর একজন বলে—আমরা কে পরে বলবো। তুমি কে আগে তাই বলো আর এতো রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছো তাও বলো?

শামীমা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেও মুখে সাহস এনে বললো—আমার আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি। পথ ছেড়ে দাও।

একজন বললো—আত্মীয়। হলুদখালি কার বাড়ি যাবে বলোনা?

শামীমা তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো—তোমাদের শুনে কোন ফল হবেনা? আমাকে যেতে দাও।

দ্বিতীয়জন বললো—শুনে ফল হবেনা এ্যাঁ কি বললে ফল হবেনা? আর তুমি যেতে দাও বললে আর—আমরা যেতে দিলাম।

প্রথমজন বললো—অন্ধকারে দেখা যচ্ছে না। মেয়েটা নিশ্চয়ই কোন বাড়ির বৌ পালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় জন বললো—যাক্ ভালই হলো ওকে নিয়ে চলো ঐ ঝোপটার আড়ালে.....

এতো শীতেও শামীমার শরীর থেকে ঘাম ছুটলো। হায় একি বিপদ হলো, মনে প্রাণে খোদাকে স্মরণ করতে লাগলো সে।

কিন্তু ততক্ষণে গুণ্ডা লোক দু'জন শামীমাকে ধরে ফেলছে। দু'জন টেনে নিয়ে চলে ঠিক ঐ মুহূর্তে পিছন থেকে কে যেন আক্রমণ করে ওদের দু'জনাকে। বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে লোক দু'টোর জামার পিছন অংশ।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা শামীমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

তবু রেহাই পায়না ওরা অন্ধকারে কে যেন এক একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেয় ওদের নাকে। নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে আসে। হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে একজন গুণ্ডা। একজন পালাতে যাচ্ছিলো। বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরে ওর ঘাড়টা দাঁতে দাঁত পিষে আর একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় ওর দাঁতের পাটিতে ছায়ামূর্তি।

কয়েকটা দাঁত ভেংগে যায় প্রথম জনের।

দ্বিতীয় জনেরও সেই অবস্থা। দুজন প্রাণ নিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায়।

এতক্ষণ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে এই অদ্ভুত কান্ড দেখ ছিলো শামীমা যদিও অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিলনা তবু সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো কেউ তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং গুণ্ডা লোক দুটিকে কাহিল করে দিয়েছে। হয়তো খোদার অসীম দয়ায় কোন মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে।

শামীমার শরীরটা তখনও বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপছিলো এক পাশে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লক্ষ্য করছিলো ছায়া মূর্তিটাকে।

শয়তান লোক দুটি পালিয়ে যেতেই ছায়ামূর্তি তার দিকে তাকালো, এগিয়ে এলো তার পাশে।

শামীমার কণ্ঠ তালো শুকিয়ে গেছে একেবারে। না জানি এ-লোকটার আবার কি উদ্দেশ্য আছে কে জানে। দেহের কাপড় ভালভাবে ঠিক করে নিলো সে।

ছায়ামূর্তি শামীমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কে তুমি? আর এতো রাতে এ ভাবে কোথাই বা যাচ্ছিলে।

শামীমার কানে এ কণ্ঠস্বর যেন অপূর্ব লাগলো। কোনদিন সে এ কণ্ঠস্বর শোনেনি তুব তার মনে হলো এ কণ্ঠ যেন তার কত পরিচিত। ভয় আর আতঙ্ক নিমিশে মুছে গেলো মন থেকে অন্ধকারে শামীমা ঐ মুখখানাকে ভাল করে দেখতে চাইলো কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। আজ আকাশে চাঁদ নেই, তারাও নেই বললে চলে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'একটা তারা পিট পিট করে জ্বলছে।

পৃথিবী যেন জমাট অন্ধকারে ভরে উঠছে। নিজের শরীরটাও ভাল করে নজরে পড়ে না।

শামীমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে ছায়ামূর্তি বললো—

কি কথা বলছোনা যে?

এবার শামীমা বললো—জানিনা আপনি কে তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি মন্দ লোক নন। আমার পরিচয় পরে বলব কারণ আমি কোন গণ্য মান্য ব্যক্তির মেয়ে বা বোন নই। আমার তেমন কোন পরিচয় নেই যা বললে আপনি চিনতে পারবেন। তবে আমার নাম বলছি, আমার নাম শামীমা।

ছায়ামূর্তি নিশ্চুপ শুনছিলো ওর কথাগুলো।

শামীমা বললো আবার আপনি যে হন আমাকে দয়া করে হলুদখালি ঘাঁটিতে পৌঁছে দিন।

এবার ছায়া মূর্তি কথা বললো—হলুদখালি ঘাঁটি!

হাঁ সেখানে আমার যেতে হবে।

কেনো?

আমি সে কথা বলবো না।

জানো সেখানে বহু মুক্তি বাহিনী ছেলেরা আছে।

আমি জানি, আরো জানি তারা আমার কোন অনিষ্ট করবেনা।

আমাকে দয়া করে নিয়ে চলুন?

বলতে হবে কেনো তুমি সেখানে যেতে চাও এবং এতোরাতে। নিশ্চয় তুমি কোন.....

না আমি কোন মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে সেখানে যাচ্ছিনা। ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার আছে।

ছায়ামূর্তি বললো—ক্যাপ্টেন হাসানকে তুমি চেনো?

হাঁ তাকে চিনি?

সে তোমাকে চেনে?

না।

তবে তুমি তাকে চিনলে কি করে?

পরে বলবো এখন আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। কারণ তাড়াতাড়ি তার কাছে আমার পৌঁছানো দরকার।

যদি বলি আমি সেই হাসান।

শামীমার নিশ্চুপ, বিস্ময়ে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেসে বলে ছায়ামূর্তি বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

শামীমার মনে তখন একটা বিপুল আলোড়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে আপনার কণ্ঠস্বর আপনার ব্যবহার আপনাকে প্রমাণ করছে আপনিই ক্যাপ্টেন হাসান।

তবে বলো কি প্রয়োজন তোমার তার কাছে? বলো কোন দ্বিধা করো না?

শামীমা সব খুলে বলে যা সে শুনেছিলো তার শয়ন কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে। তার বড় ভাই রিয়াজ আলী আল বদর বাহিনীর লোক এবং সে খানবাহিনীকে সব সময়ে সহায়তা করে এসে ছিলো। খান বাহিনী তার সাহায্যে বহু বাঙ্গালী হত্যা করেছে বহু নারীর ইজ্জৎ লুটে নিয়েছে। তবু সে ক্ষান্ত হয়নি, খান বাহিনীর পরাজয় বরণ করলেও রিয়াজ আলী গোপনে দুষ্কর্ম চালিয়ে চলেছে। এখন কোন গোপন স্থানে চলেছে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিদের উপর তাদের অকথ্য নির্যাতন।

হাসান শামীমার মুখে সব শোনে তার চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠে। তারপর বলে চলো শামীমা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর যাবো সেখানে যেখানে তোমার পিশাচ ভাই...থাক চলো এবার।

শামীমা নীরবে হাসানের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

বড় ইচ্ছা হলো একবার সে হাসানকে ভালকরে দেখে নেয় না জানি ও মুখ খানা কেমন কত সুন্দর দেখতে। যার কণ্ঠস্বর এতো মধুর যার আচরণ এতো মহৎ না জানি তার চেহারা কত অপূর্ব।

❑

পাগুলি রশি দিয়ে বেঁধে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত করে তুলেছে ওরা তাদের। গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এক একটা চাবুকের আঘাতে আর্তনাদ করছে—বুদ্ধিজীবী বেচারী এগারোজন।

অদূরে একটা চেয়ারে বসে আছে রিয়াজ আলী। পাশে আরও দু'টো চেয়ারে দু'জন আল বদর বাহিনীর কমাণ্ডার বসে আছে। এরা মুক্তিবাহিনীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করে এখনও

বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সংখ্যায় বেশ কয়েকজন এখানে আছে, এদের দলে কয়েকজন অবাঙ্গালীও আছে।

এরা সবাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপনকারী আল বদর আর রাজাকার দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গোপনে বাংলাদেশের সর্বনাশ করে চলেছে। খান হানাদার বাহিনীর সময় যে সব বাংগালী সামরিক বা বেসামরিক অফিসারদের আটক করেছিলো এবং খান সেনা বাহিনীর পরাজয় মুহূর্তে বাংলার অমূল্য সম্পদ যে সব বুদ্ধিজীবীদের বন্দী করা হয়েছিলো, তাদের হত্যা করার পর যাদেরকে কোন কোন গোপন স্থানে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিলো তাদের সরিয়ে এনে এখানে নতুনভাবে তাদের উপর অত্যাচার চলতো তারপর হত্যা করতো ওরা নৃশংসভাবে।

আজ যাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে এরা সবাই বুদ্ধিজীবী মহলের লোক। কেউ লেখক, কেউ সংবাদিক, কেউ লাইব্রেরীয়ান, কেউ শিল্পী কেউ ফটোগ্রাফার। এরা খান হানাদারদের পাশবিক অত্যচার সহ্য করেও বেঁচে ছিলো বা আছে। আজ এদের কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হবে।

চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে ওদের দেহ। রক্ত ঝরছে দর দর করে। লোকগুলো যাতে আর্তনাদ করতে না পারে সে জন্য মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। সে কি করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীগণ নানারকম অসভ্য অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে চলেছে তার সঙ্গে চলেছে নির্যাতন।

বুদ্ধিজীবীগণ আর্তনাদ করতে না পারলেও একটা গোগো শব্দ বের হচ্ছিলো তদের নাক মুখ দিয়ে, তার সঙ্গে বের হয়ে আসছিলো রক্ত। নির্দয় পাষণ্ড দল তারই উপর চালাচ্ছিলো আঘাতের পর আঘাত।

এবার রিয়াজ আলীর আদেশে বন্দীদের নামিয়ে নেওয়া হলো। দু'জন জোয়ান লোক দু'খানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা হাতে এগিয়ে এলো।

বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা একেবারে কাহিল। ওদের মুখের মধ্য থেকে রুমাল টেনে বের করে নেওয়া হলো। কারো কারো মুখে লাগামের মত করে রশি দিয়ে এঁটে বাঁধা হয়েছিলো এবার খুলে নেওয়া হলো ওদের মুখের রশি খণ্ড।

একজন গোঙ্গানীর স্বরে বললো—একুট পানি! একটু পানি দাও.....

রিয়াজ আলী বললো পানি খাবে? সবুর করো পানি এনে দিচ্ছে। তারপর নিজেদের একজনকে বললো—যাও প্রস্রাব করে নিয়ে এসো, তাই খেতে দাও।

সত্যি সত্যি লোকটা চলে গেলো একটু পরে একটা মাটির বাসনে প্রস্রাব এনে বাড়িয়ে ধরলো—নাও পানি খাবে বলেছিলে খাও।

বন্দী লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিলো, অতি কষ্টে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা চাট্‌লো একবার।

রিয়াজ আলী বললো—ওর মুখে ছড়িয়ে দাও।

রিয়াজ আলীর কথায় শয়তান তাই করলো, প্রস্রাবগুলো ছড়িয়ে দিলো অসহায় বন্দীটির চোখে মুখে।

হয়তো এই মুহূর্তে খোদার আরশটাও দুলে উঠলো। নিষ্পাপ বন্দীদের উপর এই অমানুষিক আচরণ তিনিও সহ্য করতে পারছেন না।

রিয়াজ আলী এবার হুকুম দিলো ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে এদেরকেও ঠিক ঐ ভাবে হত্যা করতে হবে।

আর একজন বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন রিয়াজ সাহেব না হলে সেই সব বুদ্ধিজীবীদের আত্মা রাগ করবে।

হাঁ প্রথমে এদের চোখ তুলে ফেলে চোখে লবন লাগিয়ে দাও। বললো রিয়াজ আলী।

আর একজন বললো—তারপর হাতের আংগুলগুলো কেটে ফেলো।

তারপর পা দু'টো কাটো। পরে হাত দু'খানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো। এই কথাগুলো বললো অপর একজন।

রিয়াজ আলী বললো—হাঁ ঠিক্ ঐভাবে কাটবে! আজ জীবনে মারবে না, সমস্ত রাত লবন পানি ক্ষত স্থানে দেবে তারপর কাল এদের বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করে নেবে।

অসহায় বন্দী বুদ্ধিজীবীরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, তাদের কানে কথাগুলো প্রবেশ করছিলো কিনা বোঝা যাচ্ছিলো না। মেঝেতে লম্বা করে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো।

যে লোকটা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা নিয়ে হুকুমের প্রতিক্ষা করছিলো সে এবার এগিয়ে যায়, প্রথমে সাহিত্যিক ফরিদ হোসেনের চোখ তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় রিয়াজ আলীর পিছনে, হাতে তার রিভলভার। বজ্র কঠিন কণ্ঠে বলে—খবরদার এক পা নড়বে না কেউ।

ফিরে তাকায় রিয়াজ আলী, সঙ্গে সঙ্গে বীবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। অন্যান্য যে কয়জন লোক ছিলো তারা সবাই ভয় বিহ্বল চোখে তাকাতে লাগলো এ ওর মুখের দিকে।

ছায়ামূর্তির হাতে উদ্যত রিভলভার, ঠিক দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে যমদূতের মত। যে লোক দু'জন সূতীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র হাতে বুদ্ধিজীবীদের চোখ তুলতে যাচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে ভীত ভাবে তাকিয়ে থকে দরজায় দাঁড়ানো জমকালো পোশাক পরা যমদূতের মত ছায়ামূর্তির দিকে।

কক্ষ মধ্যে কারো হাতেই কোন আগ্নেয় অস্ত্র ছিলো না শুধু একটা ছোরা ছিল টেবিলে আর একটা চাবুক। যে চাবুক দিয়ে এতোক্ষণ বন্দীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো। ছোরা খানা দিয়ে বন্দীদের বুক চিরে হৃদপিন্ড বের করে নেওয়া হবে সব শেষে।

ছায়ামূর্তি কক্ষ মধ্যে সকলের উপর দৃষ্টি বৃলিয়ে নিলো। মেঝেতে পড়ে থাকা বন্দীদের দিকে তাকিয়েও দেখলো সে। হয়তো বা ব্যথায় বুকটা তার মোচড় দিয়ে উঠলো। তাকালো এবার সে রিয়াজ আলীর দিকে, আলী সাহেব আপনি দোস্তদের নিয়ে এখানে আত্মগোপন করে খুব সুন্দর কাজ করেছেন দেখে খুশি হলাম।

এক অজ্ঞাত মানুষের মুখে নিজের নামের শেষ অংশ শুনে রিয়াজ আলী আশ্চর্য হলো। কোন কথা সে বলতে পারলোনা।

ছায়ামূর্তি বললেন আপনার সুকর্মের পুরস্কার দিতে এলাম। শুধু আপনাকেই নয় আপনার সঙ্গী দালালদেরকেও দেবো। এবার চেয়ার ত্যাগ করে উঠে পড়ুন আলী সাহেব। উঠুন...

রিয়াজ আলী এতোক্ষণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গী দু'জন যারা বসে ছিলো তারাও উঠে পড়ে।

কক্ষ মধ্যে আরও কয়েকজন ছিলো সবাই ভয় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে, এমন একটা বিপদের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা।

ছায়ামূর্তি যে কে তারা জানেনা, তার চেয়ে ছায়ামূর্তির হাতের অস্ত্র খানই তাদের বেশি আতঙ্কের বিষয়!

ছায়ামূর্তি এবার বললো—ভয় নেই, কাউকেই আমি হত্যা করবো না। হত্যা করলে তোমাদের কর্মের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে না। আলী

সাহেব আপনি নিজ হাতে বন্দীদের হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিন। যান এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

রিয়াজ আলী ও তার দলবল দালালরা সবাই কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে বললো দিন ওদের বাঁধন খুলে দিন।

এবার রিয়াজ আলী বললো—তুমি কে?

ছায়ামূর্তি হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ আমি কে জানতে চাও। তবে শোন দালাল রিয়াজ, আমি একজন মুক্তি যোদ্ধা, কি অমন শিউরে উঠলে কেনো। বিচ্ছুর বাচ্চাদের দেখে ভয় করতো যারা, তারা খান সেনার দল। তোমরা বাংলাদেশের মানুষ বাঙ্গালী, তোমরা কোনো মুক্তি বাহিনীর নাম শুনে ভয় পাচ্ছো? জবাব দাও ভয় পাবার কারণ কি?

রিয়াজ আলী কোন জবাব দিলোনা। সে এই শীতের রাতে ঘেমে নেয়ে উঠেছে একেবারে। তার সঙ্গী সাথীদের অবস্থাও কাহিল। তারাও রীতি মত ঘামছে।

ছায়ামূর্তির ধমক খেয়ে রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীরা বুদ্ধিজীবী বন্দীদের বন্ধন উন্মোচন করে দিলো।

বুদ্ধিজীবী বন্দীগণ সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কেমন যেন হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ভেবে পান না কি ঘটেছে বা ঘটতে চলছে। কে এই অজ্ঞাত ব্যাক্তি যার দয়ায় আজ এই মুহূর্তে তাঁরা মৃত্যু থেকে রেহাই পেলো। দীর্ঘ নয় মাস তাঁরা বন্দী ছিলেন, তাঁদের উপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন বাঁচার আশা তাদের ছিলো না কোন সময়। আজ ছিলো তাঁদের মৃত্যুর তারিখ। বুদ্ধিজীবী বন্দীগণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলেন জমকালো পোশাক পরা ছায়ামূর্তিটির দিকে। ছায়ামূর্তির মুখমণ্ডলের অর্ধেক অংশ কালো রুমালে ঢাকা থাকায় তার মুখখানা দেখা যাচ্ছিলো না শুধু চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে কক্ষের সল্প আলোতে।

বুদ্ধিজীবী বন্দীদের মুক্ত করে তাদের এক পাশে যত্ন সহকারে বসিয়ে দিলো ছায়ামূর্তি। তার পর রিয়াজ আলীর দুজন সঙ্গীকে আদেশ দিলো রিয়াজ আলী ও তার দলবলকে মজবুত করে বেঁধে ফেলতে। ছায়ামূর্তির হাতে রয়েছে উদ্যত রিভলভার। কাজেই তার কথা অমান্য করে এমন সাহস কারো ছিলনা। রিয়াজ আলীর সঙ্গী দু'জন যাদের হাতের সূতীক্ষ্ণ ছোরা

ছিলো। তাদের উপরই ছায়ামূর্তি আদেশ দিয়েছিলো। রিয়াজ আলী আরও দুজন বাঙ্গালী দালাল এবং দুজন অবাঙ্গালী দালাল মোট পাঁচজন দালালকে বেঁধে ফেললো ওদের সঙ্গী দু'জন।

বুদ্ধিজীবীদের বন্ধন মুক্ত করায় প্রচুর দড়ি ছিলো সেখানে। কাজেই কোন অসুবিধা হলোনা।

ওদের মজবুত করে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোক দু'টো। তাদের চোখে মুখেও ভীত আতঙ্ক ভাব ফুটে উঠেছে। না জানি তাদের ভাগ্যে কি ঘটে কে জানে।

রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীদের মুখ মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কারো মুখে কোন কথা নাই। ওরা বুঝতে পেরেছে এবার তাদের পালা।

ছায়ামূর্তি এবার লোক দুটির উপর হুকুম করে—তোমরা একটু পূর্বে যেমনভাবে বন্দীদের চোখ তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো ঠিক তেমনি করে এদের চোখগুলি তুলে নাও।

ছায়ামূর্তির কথা শুনে আঁতকে উঠলো রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীরা। কাঁপতে শুরু করেছে ওরা।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে বলে—কাজ শুরু করো। যাও বলছি।

অগত্যা লোক দুটো এগিয়ে গেলো। প্রথম রিয়াজ আলীর চোখ উপড়ে নেওয়া হলো। ছায়ামূর্তির নির্দেশে মুখে রুমাল গুঁজে দেওয়া হয়েছিলো।

রিয়াজ আলী ও তার চারজন সঙ্গীর চোখ তুলে ফেলা হলো। তারপর হাতের আংগুল পরে পা কেটে ফেলা হলো দেহ থেকে। নাক কানও বিচ্ছিন্ন করে ফেললো ওরা ছায়ামূর্তির নির্দেশে।

ছায়ামূর্তি এবার অট্টহাসি হেসে বললো—দেখুন রিয়াজ আলী আপনারা যখন খান সেনাবাহিনীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত শত বুদ্ধিজীবীদের উপর নির্মম অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে চলেছিলেন তখন তাদের অবস্থা কেমন হয়েছিলো এবার তা একটু উপলব্ধি করুন। হাঁ জীবনে আপনাদের হত্যা করবোনা কারণ হত্যা করলেই তো শেষ, কজেই বেঁচে থেকে উপভোগ করুন বাংলার শত শত মানুষ আপনাদের নির্যাতনে কি ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এর পর সেই দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে ছায়ামূর্তি—তোমরা আমার নির্দেশমত কাজ করলে—এ জন্য তোমাদের আমি বেশি কষ্ট দেবো না। তোমরা ঐ দেয়ালের পাশে গিয়ে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

লোক দুটো বুঝতে পারলো এবার তাদের পালা। তারা ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো, ছুটে এসে একজন পা জড়িয়ে ধরলো।

সরে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—তোমাদের মুক্তি দেবার জন্যই আমি ব্যবস্থা করছি। যে কাজ তোমরা এতোদিন করেছো তার শাস্তি আমি দেবোনা। যাও ওদিকে মুখ করে দাঁড়াও।

বাধ্য হলো ওরা।

ছায়ামূর্তি রিভলভার তুলে ধরলো সঙ্গে সঙ্গে দুটো শব্দ হলো। লোক দুটির রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়লো। ছায়ামূর্তি এবার রিয়াজ আলীর পাশে এসে দাঁড়ালো। একটানে ওর মুখের রুমাল বের করে নিতেই গোঙ্গানীর মত করে কেঁদে উঠলো।

ছায়ামূর্তি বললো—আলী সাহেব এবার বলুন—আপনাদের আর-আর বন্ধু লোক কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে?

আঃ আঃ উঃ কি অসহ্য জ্বালা.....রিয়াজ আলী তখন একটানা আর্তনাদ করে চলেছে।

ছায়ামূর্তি রিভলভার দিয়ে রিয়াজ আলীর বুকে গুতো দিয়ে বলে—কেমন উপভোগ করছেন? দেখুন এবার বুঝুন আপনাদের হাতে কত লোক এমনি কষ্ট পেয়েছে। আজই তো কতকগুলো নিষ্পাপ ব্যক্তির উপর আপনারা এমনি নির্যাতন চালাতেন। সে কথা স্মরণ করুন মনপ্রাণে। হাঁ জবাব দিন আপনাদের লোক কোথায় আছে বলুন?

বলবো—বলবো আমাকে গুলি করে হত্য করো তাহলে বলবো। এতো কষ্ট সহ্য করতে পারছিনা.....

বলুন তারপর যা হয় করবো।

বলছি—বলছি মরবোই যখন তখন সব বলবো যদি এতে পাপ কিছু লাঘব হয়।

হাঁ বলুন?

রিয়াজ আলীর দেহটা তখন মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলো। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে তার জামা কাপড় ও মেঝেটা। রিয়াজ আলীর সঙ্গী সাথীদের অবস্থাও তাই। মাংস পিণ্ডের মত এক একজন ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিলো।

রিয়াজ আলী বলে—হাতীমারী বলে একটা জায়গা আছে সেখানে এখনও অনেক খান সেনা লুকিয়ে আছে। সেখানে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে।

আর বাঙ্গালী দালাল বন্ধুরা সেখানে নেই? বললো ছায়ামূর্তি।

আছে। আছে তিনজন নামকরা লোক সেখনে যারা খান সেনাদের সাহায্য করেছে। তাদের সহায়তায় বহু মানুষ নিহত হয়েছে। বহু মেয়ে মানুষকে তারা ধরে নিয়ে খান বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে।

হাঁ তারপর?

হাতি মারীতেই একটা গুদামে এখনও অনেকগুলি মেয়ে মানুষ বন্দী আছে। তাদেরকে ওরা মেরে ফেলবে বলেছে। কারণ ওদের ছেড়ে দিলে সবাইরে গিয়ে সব কথা ফাঁস করে দেবে তাই—তাই ওদের মুক্তি দেওয়া হবে না।

ছায়ামূর্তি বললো—হাতিমারী কোন যায়গায় সেই আস্তানা রয়েছে—যেখানে এখনও খান সেনাবাহিনী আত্মগোপন করে আছে?

হাতিমারীতে বহু অবাঙ্গালী আছে ঐ অবাঙ্গালীদের কলোনীতেই আছে তারা। আমি আর বলতে পারছিনা.....আঃ মরলাম—মা বাবা বাবা মরলাম.....

ছায়ামূর্তি আর বিলম্ব করেনা, সে বুদ্ধিজীবীদের পাশে এসে দাঁড়ায় বলে,—আপনারা হাঁটতে পারবেন কি?

বুদ্ধিজীবীরা এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছায়ামূর্তির কার্য কলাপ লক্ষ্য করছিলো। তারা নিজেদের কষ্ট ব্যথা ভুলে গিয়েছিলো। ছায়ামূর্তিকে তারা জানেনা তবে এটুকু তারা বুঝতে পারলেন সে যেই হোক বাংলাদেশের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

বুদ্ধিজীবীরা বললেন—পারবো।

কষ্ট হবে আপনাদের তবু যেতে হবে। এখান থেকে দেড় মাইল দূরে হলুদখালি হসপিটাল আপনাদের সেখানেই নিয়ে যাবো।

ছায়ামূর্তি বুদ্ধিজীবীদের এক একজনকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো তবে একজনের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিলো তাকে ছায়ামূর্তি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বললো—এবার আপনারা চলুন।

ছায়ামূর্তির সঙ্গে মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো বন্দী বুদ্ধিজীবী কয়েকজন। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলেন তারা। দীর্ঘ নয় মাস হলো বাইরের আলো বাতাসের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলোনা।

আজ তারা মুক্ত স্বাধীন কথাটা ভাবতেই সব দুঃখ ভুলে যায়, হাঁটতে থাকে তাঁরা ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে। যদিও হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো তবু তারা প্রাণপণে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর হাই তুলে শয্যায় উঠে বসতেই এগিয়ে এলো হীরা রোস্তম, মাহবুব আরও কয়েকজন। সবাই ঘিরে দাঁড়লো বনহুরকে।

হীরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো—হাসান ভাই একটা সংবাদ।

সংবাদ! কি সংবাদ হীরা? তোমাদের দেখে খুব উত্তেজিত এবং আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে।

হীরা বললো—হাসান ভাই হলুদখালির পূর্ব পাড়ায় একটা গোপন বাড়িতে কতকগুলো লোককে ভীষণ এক অবস্থায় পাওয়া গেছে।

অবাক হয়ে বললো বনহুর—ভীষণ অবস্থা মানে?

হীরা পর্বের ন্যায় ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—একটা বাড়ির মধ্যে কয়েকজন লোককে হাত পা কান নাক কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

তা এমন আর কি ব্যাপার? স্বাভাবিক গলায় বললো বনহুর?

হীরা বললো—এমন অবস্থায় এতগুলো লোক আর তুমি বলছো তা এমন আর কি ব্যাপার?

তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা খুব বেশি খুশি হয়েছো খুশির কি আছে।

হীরা বললো—জানোনা হাসান ভাই এরা খান সেনা বাহিনীর একনম্বর সাহায্যকারী দালাল ছিলো। না জানি কারা এদের কাজের উচিৎ পুরষ্কার দিয়েছে।

বনহুর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—আচ্ছা একেবারে এদের হাত পা নাক কান কেটে ফেলা হয়েছে?

বলে উঠলো মাহবুব—শুধু হাত পা নাক কান নয় ওদের চোখগুলোও উপড়ে ফেলা হয়েছে।

বলো কি?

হাঁ হাসান ভাই।

তবু বেঁচে আছে ওরা?

আছে কিন্তু এখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি হয়তো মরবে।

বনহুর আপন মনে বলে উঠলো—বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালী হত্যা যজ্ঞে এরা খান সেনা বাহিনীকে সহায়তা করেছিলো, সত্যি দুঃখ হয় এরা মানুষ না পশু।

হামিদ বললো—জান হাসান ভাই ওরা বললো, কে নাকি একজন জমকালো পোশাক পরা লোক তাদের এ অবস্থা করেছে। দু'জনকে গুলি করে হত্যাও করেছে সেই অজ্ঞাত ব্যাক্তি।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ।

এমন সময় মহসীন ব্যস্ত হয়ে সেখানে প্রবেশ করলো।

একজন মহসীনকে লক্ষ্য করে বললো—ব্যাপার কি অমন করে হাঁপাচ্ছিস কেনো।

একটা ঘটনা.....

তোর আগে আমরা দেখে এসেছি। হাত পা কান নাক কাটা লোকগুলো কথা তো? কথাগুলো বললো রোস্তম।

মহসীন বললো—হাত পা কান নাক কাটা এসব কি বলছিস রোস্তম?

হাঁ সত্যি সত্যি বলছি। তুই তবে কি ঘটনা শোনাবী? নতুন কিছু বুঝি?

আমি হসপিটাল থেকে আসছি। বললো মহসীন।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—কি ব্যাপার হসপিটালে আবার কি ঘটলো?

মহসীন বললো—হাসান ভাই আজ রাতে হসপিটালে এগারো জন আহত বন্দী বুদ্ধিজীবীকে কে বা কারা রেখে গেছে।

সবাই অবাক হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় মহসীনকে। তার মুখে ঘটনা শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলো যেন। মহসীন বললো চলুন হাসান ভাই দেখবেন চলুন।

হীরা বললো—হাঁ চলো হাসান ভাই কোথা থেকে এ বুদ্ধিজীবীরা হলুদখালি হসপিটালে এসেছেন এবং কে তাঁদের রেখে গেছেন জানা দরকার।

বনহুর উঠে দাঁড়লো—তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমি আসি, মুখ হাত ধুয়ে আসি।

মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা সবাই হলুদ খালি হসপিটালে যাবার তৈরি হয়ে নেয়।

অল্পক্ষণে ফিরে আসে বনহুর।

সবাই মিলে রওয়ানা দেয় হলুদখালি হসপিটাল অভিমুখে।

হসপিটালে পৌছে বনহুর ছেলেদের নিয়ে সর্বপ্রথম অসুস্থ বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে দেখা করে। বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করে শোনায়।

সব শুনে বনহুরের সঙ্গীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। যে সব দালালদের হাত পা নাক কান কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে তারাই বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা সেই রকম করবে বলে প্রস্তুতি নিয়েছিলো কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি।

হঠাৎ এক বলিষ্ঠ পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হয়ে দালালদের দ্বারাতেই অন্যান্য দালালদের অবস্থা তাদের পরিকল্পনা মত করেছে।

সব যেন আশ্চর্য লাগে, অদ্ভুত মনে হয়। সবাই ভাবে কে সে মহাপুরুষ যে রাতের অন্ধকারে আবির্ভূত হয়ে পরোপকার করে বেড়ায়। তার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয় সবার মাথা।

হলুদখালি ঘাটির মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা সবাই শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষিত ছেলেও আছে তাদের মধ্যে। হামিদ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এস, সি পাশ করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিলো সেই হামিদ এ কথা শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—হাসান ভাই জানি না কে সেই বন্ধু যার অসীম দয়ায় এতোগুলো মূল্যবান জীবন আজ রক্ষা পেয়েছে।

মাসুদ বলে উঠলো—তাকে যদি একবার পেতাম তাহলে.....

তাহলে কি করতে মাসুদ? বললো বনহুর।

অন্তর দিয়ে তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতাম।

একটু হাসলো বনহুর তারপর বললো—তোমাদের ভালবাসা শ্রদ্ধা সে যেখানেই থাকুক গ্রহণ করেছে ভাই। তোমাদের ভালবাসাই যে তার একমাত্র কাম্য।

বনহুরের কথাটা তখন গভীরভাবে কারো ভেবে দেখার সময় ছিলো না। হসপিটালের বড় ডাক্তার এলেন ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে। বুদ্ধিজীবিদের অসুস্থতা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে।

হসপিটাল থেকে ঘাঁটিতে ফিরতে বেলা হয়ে গেলো অনেক।

❑

রিয়াজ আলীর বাড়ি।

সমস্ত বাড়ি কান্নার করুণ বিলাপে ভরে উঠেছে। রিয়াজ আলীকে একটা ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সব। এখনও রক্ত বন্ধ হয়নি, ডাক্তার ডাকা হয়েছিলো কিন্তু ডাক্তার আসতে রাজি হয়নি! শেষে এক হাতুরে ডাক্তার এসে কিছু ঔষধ পত্র দিয়েছে তাতে কিছু ফল হয়নি রক্তও বন্ধ হলো না।

শামীমা ভাইয়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে। যদিও সে নিজেই এর জন্য দায়ী কিন্তু এক ছাড়া তার কোন উপায় ছিলোনা। কত লোক রিয়াজ আলীর চক্রান্তে আত্মহুতি দিয়েছে তার কোন

হিসেব নেই। শামীমা চেয়েছিলো তার ভাই ও তার দল বলকে সায়েস্তা করে অসহায় বুদ্ধিজীবীদের রক্ষা করবে হাসান। ভাবেনি যে রিয়াজ আলীর এ অবস্থা হবে।

শামীমা সব জেনেও কিছু বলতে পারে না বা বলেনা। শুধু রাগ হয় তার হাসানের উপর। এতো নির্দয় সে। দু'দিন পর রিয়াজ আলী মারা গেলো। তার সহকর্মীদের সবাই তখন মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছে। এতো রক্ত ক্ষয়ের পর কেউ কি বাঁচতে পারে।

যে রাতে রিয়াজ আলী মৃত্যু বরণ করলো সেই রাতে শামীমা বেরিয়ে পড়লো ক্যাপ্টেন হাসানের উদ্যেশে। থম থমে রাত, আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন মাঝে মাঝে বিদুৎ চমকাচ্ছে।

শামীমা দ্রুত এগুচ্ছে যেমন করে হোক আজ সে ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সে কি বলছিলো তার ভাইকে এ ভাবে হত্যা করুক। হাসান কেনো এ ভাবে তার ভাই এর হাত পা নাক কান কেটে তাকে কষ্ট দিলো জিজ্ঞাসা করবে সে তার কাছে.....

হঠাৎ একটা বাজ পড়লো অদূরে কোথাও। শামীমার চিন্তা জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ভয় পেয়ে গেলো সে ভীষণ ভাবে। ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকটা ছেলে সেই পথে যাচ্ছিলো বিদ্যুতের আলোতে তারা শামীমাকে দেখে আশ্চর্য হলো এতো রাতে এ পথে মেয়ে লোক কোথায় যাচ্ছে। নিশ্চই কোন বিপদে পড়েছে বোধ হয়।

ছেলের দল শামীমার কাছে এসে বললো আপনি কে? কোথায় যাবেন?

শামীমা বললো—আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমাকে হলুদখালী ঘাটিতে নিয়ে যাবেন একটু?

ছেলেরা হলুদখালি ঘাটিতেই যাচ্ছিলো একজন বললো—আমরা সেখানেই যাচ্ছি। আপনি সেখানে কেনো যাবেন জানতে পারি কি?

শামীমা বললো আমি ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে যাবো আর একজন বললো—বেশ চলুন।

শামীমা তরুণদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

তরুণ মুক্তিযোদ্ধাগণ কিছুটা অবাক না হয়ে পারেনা। তারা ভাবে এ মেয়েটির সঙ্গে তাদের হাসান ভাই এর কি সম্পর্ক আছে। মনে মনে ভাবলেও কেউ মুখে কিছু প্রকাশ করেনা।

হলুদখালি ঘাটিতে পৌছেই দু'জন ছেলে ছুটে গেলো ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে।

হাসান তখন একটা বই পড়ছিলো, চোখ না তুলেই বললো—তোমাদের ফিরতে এতো রাত হলো কেনো?

একজন বললো—পথে হঠাৎ একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

মেয়ে? অবাক হয়ে তাকালো হাসান ছেলেটির মুখে।

হাঁ একটি মেয়ে। দেখো হাসান ভাই আমরা শিবপুর থেকে আসছি হঠাৎ পথে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। মেয়েটা বিপদে পড়েছে মনে করে আমরা এগিয়ে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করায় বললো, সে হলুদখালি ঘাটিতে যেতে চায় এবং ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। জানিনা কে সে কিই বা তার পরিচয় আর কেনই বা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললো সেলিম।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো হাসানের, বই রেখে সোজা হয়ে বসে বললো —কোথায় সে মেয়েটি?

পাশের কামড়ায় বসিয়েছি! তুমি চলো হাসান ভাই। বললো খালেক।

হাসান বললো—আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু তোমরা আমার পরিচয় দেবে না তার কাছে। তোমরা বলবে আমার নাম ফরিদ খান।

হাসানের কথা মত শামীমার কাছে কেউ তার পরিচয় বললো না। সবার সঙ্গে হাসান যখন এসে দাঁড়ালো শামীমার সামনে তখন শামীমা বিস্ময় নিয়ে তাকালো তার দিকে।

মাসুদ বললো—হাসান ভাই ঘাঁটিতে নাই, আপনি ফরিদ ভাই এর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

মুহূর্তে শামীমার মুখ মণ্ডল নিস্প্রভ হলো সে ভেবেছিলো তার সম্মুখে যে এসে দাড়ালো সেই বুঝি ক্যাপ্টেন হাসান অবশ্য সেই রাতে শামীমা ক্যাপ্টেন হাসানকে দেখেছিলো কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে দেখেনি সেদিন রাতের অন্ধকারে। তাই হাসান কে শামীমা আজ আলোর সামনে চিনতে পারে না।

মাসুদের কথায় বলে শামীমা—আমার দরকার ক্যাপ্টেন হাসান কে ফরিদ ভাইকে নয়।

হাসান মাথা চুলকে বলে দুঃখিত আজ সে ফিরবে কি না ঠিক নেই। আপনি কি আজ আমাদের ঘাঁটিতে অপেক্ষা করতে চান?

শামীমা সহসা কোন জবাব দিতে পারেনা। আজ সে কতটা পথ অনেক কষ্ট করে এসেছে। ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে দেখা করা তার একান্ত আবশ্যক। সে চায়নি তার ভাইকে ওভাবে শাস্তি দিয়ে সায়েস্তা করুক। একটা অভিমান দানা বেঁধে উঠেছে তার মনে। বলে শামীমা—না।

তবে আপনি বলে যেতে পারেন ক্যাপ্টেন হাসানকে কিছু বলবার থাকলে? বললো হাসান।

না, তাকেই বলবো!

তবে আমরা কি করতে পারি? আপনি তাহলে যেতে পারেন আমাদের ছেলেরা আপনাকে পৌঁছে দেবে।

না, লাগবেনা। আমি একাই যেতে পারবো। শামীমা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

হাসান বলে—হারুন, খালেদ তোমরা দু'জন যাও ওকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে এসো।

শামীমা একবার ক্যাপ্টেন হাসানের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

শামীমা বেরিয়ে যায় তার সঙ্গে যায় হারুন আর খালেদ।

আকাশ তখন মেঘ শূন্য হয়ে এসেছে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই মাসুদ বললো—হাসান ভাই আমরা মনে করেছিলাম মেয়েটির সংগে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটি তোমায় দেখেও চিনতে পারলোনা।

বনহুর একটু হাসলো সে বুঝতে পেরেছিলো, ছেলেরা ঐ রকম কিছু ভেবেছিলো মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তাই বনহুর নিজের পরিচয় গোপন করে দেখলো মেয়েটি তাকে চেনেনা শুধু জানতো তার নামটা। আরও একটা কারণে সে নিজের পরিচয় দেয়নি সে হলো শামীমা নিশ্চয়ই তার ভাইএর মৃত্যু ব্যাপার নিয়েই ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে এসেছে এবং তার পরিচয় পেলে ব্যাপারটা বলবে। তখন ছেলেরা সবাই জেনে নেবে এ সব তাদের হাসান ভাইএর কাজ। বনহুর আত্মগোপন করে কাজ করে যাবে এই তার উদ্দেশ্য। বললো বনহুর—মেয়েটি আমায় চেনেনা সত্য।

এবার হীরা বলে উঠে—ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে তার কি প্রয়োজন ছিলো তাতো জেনে নিলে না তুমি?

আমি জানি সে কি বলতে এসেছিলো।

তুমি জানো?

হাঁ।

কি প্রয়োজনে মেয়েটি তোমার কাছে এসেছিলো বলোনা হাসান ভাই?

বলছি। ঐ মেয়েটি দালাল নেতা রিয়াজ আলীর বোন।

রিয়াজ আলীর বোন?

হাঁ, সে এসেছিলো আমার কাছে জানতে কে বা কারা তার ভাইকে এ ভাবে—মানে এ অবস্থা করেছিলো।

ও এবার বুঝতে পেরেছি ঐ মেয়েটি আমাদের মানে মুক্তি বাহিনী ছেলেদের সন্দেহ করে।

হাঁ ঠিক্ তাই।

তবে ও বললোনা কেনো?

জানে সবার কাছে বলে কোন ফল হবেনা। সে ক্যাপ্টেনের মুখে শুনতে এসেছিলো। যাক ওরা ওকে ঠিক পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। তোমরা সবাই শোবে যাও রাত অনেক হয়েছে। আর শোন কাল তোমাদের মসিপুরে সাকো তৈরি ব্যাপারে যেতে হবে। মসিপুরে সাকোটা খান সেনারা নষ্ট করে দিয়েছে কাজেই মসিপুরের লোকদের খুব কষ্ট হচ্ছে। সাকো নষ্ট হওয়ায় তারা হাট বাজারে যেতে পারছেনা। এ গ্রামের সবই গরিব, সাকো তৈরি ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য না পেলে ওরা কিছুই পারবে না। ওদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করবার জন্য তোমরা শীঘ্র কাজে নেমে পড়বে।

হাসানের কথায় সবাই সম্মতি জানিয়ে সেই রাতের মত বিদায় গ্রহণ করলো।

হাসান নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলো।

❑

হাসান শুয়ে শুয়ে এ পাশ ও পাশ করছে। একটু আগে ফিরে এসেছে হারুন ও খালেদ শামীমাকে পৌঁছে দিয়ে।

এখন আকাশ মেঘমুক্ত হলেও খুব পরিস্কার হয়নি। হাসান হাত ঘড়িটা দেখে নিলো রাত এখন দু'টো বাজে। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়লো হাসান, তার ছোট্ট সুইটকেশটা খুলে বের করে নিলো জমকালো পোশাকটা। পোশাকটা পরে নিয়ে বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে।

অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে চললো হাসান মাঠের মধ্য দিয়ে। কখনও আইল ধরে কখনও বা পায়ে চলা পথ বেয়ে এগিয়ে চললো।

রিয়াজ আলীর বাড়ির দরজায় এসে থামলো সে।

সেদিন শামীমা বলেছিলো ওদিকের ঘরটায় শোয় সে? ঐ জানালা দিয়েই নাকি শামীম দেখতো তার ভাই এর কীর্তি কলাপ।

ক্যাপ্টেন হাসান শামীমার জানালায় মৃদু টোকা দেয়। একবার দু'বার তিনবার। জানালা খুলে যায় বলে—কে?

আমি হাসান।

অন্ধকারে শামীমা চিনতে পারে হাঁ হাসানই বটে, শরীরে তার জমকালো পোশাক। বলে শামীমা—আপনি এসেছেন?

হাঁ, শুনলাম তুমি নাকি আমাদের ক্যাম্পে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম?

কেনো?

ক্যাপ্টেন হাসান আমি জানতাম আপনি অতি মহৎ কিন্তু.....

থামলে কেনো বলো?

আপনি আরও সরে আসুন না হলে কেউ দেখে ফেলবে।

হাসান আরও সরে দাঁড়ালো জানালার পাশে।

শামীমা বললো—আপনি আমার ভাইজানকে এভাবে কষ্ট দেবেন আমি ভাবতে পারিনি।

তুমি কি এ কথাটাই আমাকে বলতে গিয়েছিলে?

না আমি জানতে গিয়েছিলাম কেনো আপনি ভাইজান ও তার দলবলের এ অবস্থা করেছিলেন? এ ছাড়া কি তাদের জন্য অন্য শাস্তি ছিলোনা?

না।

কেনো পুলিশের হাতে দিলেই পারতেন?

ক্যাপ্টেন হাসান কোনদিন দোষীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়না শামীমা। তুমি শোন তোমার ভাই যে অপরাধ করেছিলো তার উপযুক্ত সাজা আমি দিয়েছি। শুধু তাকেই নয় আরও অনেক ব্যাক্তিকে আমি ঐরূপ সাজা দেবো কারণ তারা শুধু বাংলার শত শত নিরীহ মানুষ হত্যাই করেনি শত শত বোনের ইজ্জত লুটে নিয়েছে। নিজেদের মা বোনকে তুলে দিয়েছে বর্বর খান বাহিনী যোয়ানদের হাতে। যাক্ তুমি ভাইএর জন্য আপসোস করোনা শামীমা। বাংলার ঘরে ঘরে তোমার লক্ষ লক্ষ ভাই তোমাদের ইজ্জত রক্ষার জন্য, তোমাদের সুখ শান্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শামীমা তুমি ভুলে যাও তোমার ঐ অসৎ জানোয়ার ভাইএর কথা।

হাসানের কথাগুলো শামীমার হৃদয়ে অনাবিল শান্তি এনেদিলো? সত্যি তার ভাই যে জঘন্য কাজ করেছে ঠিক তারই উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছে। সত্যি তো বাংলার লক্ষ লক্ষ যুবক তার ভাই। আজ তারাই তো বুক ভরা আশা ভরসা নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে মা বোনদের পাশে এসে দাঁড়াবে। যে মায়েরা সন্তান হারিয়েছে—যে বোনেরা ভাই হারিয়েছে তাদের চোখের পানি মুছিয়ে দেবে তারা, হাসি ফোটাবে তাদের মুখে। শামীমা বলে এবার—একটা কথা বলবো।

বলো?

আমি কি দেশ গড়ার কোন কাজে আপনাদের সাহায্য করতে পারিনা?

নিশ্চয়ই পারো।

তা হলে আমাকে যদি আপনারা কাজ দিতেন আমি মাথা পেতে করবো।

বেশ, যখন প্রয়োজন হয় ডাকবো।

আমি প্রতিক্ষা করবো আপনার।

চলি তাহলে?

হাসান চলে গেলো। শামীমা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারময় জানালার পাশে।

❑

মসিপুর সাকো মেরামত কাজে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হাসান নিজেও কাজ করে চলেছে। গ্রামের অনেক চাষীগণ এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। কোদাল চালাচ্ছে কেউ, কেউ বা ঝাঁকায় মাটি নিয়ে সাঁকোর পাশে ফেলছে কেউ খুঁটি কাটছে, কেউ গর্ত করছে।

ক্যাপ্টেন হাসানের উৎসাহে উৎসাহিত সবাই। কারো মুখে এতোটুকু ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন নাই। হাসান নিজেও কোদাল চালাচ্ছে।

সবাইকে বলেছে হাসান তোমরা সকলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তোমাদের সকলের সহায়তা না পেলে বর্বর হানাদার দ্বারা বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনরায় স্বাভাবিক করা সম্ভব হবেনা। বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে হতে হবে চরিত্রবান; আদর্শ, মহৎ তাহলেই সোনার বাংলা সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হবে। সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে অক্লান্তভাবে। আত্মত্যাগ দিতে হবে। পরের মুখোপেক্ষী হওয়া কোনদিন উচিৎ নয়। কারণ বাংলাদেশ তোমাদেরই দেশ, এদেশের প্রতিটি জিনিস তোমাদের। কাজেই তোমাদের কর্তব্য নিজের দেশকে সুন্দর আদর্শ দেশ হিসাবে তোমরা গড়ে তুলবে। দুর্নীতি অন্যায় অবিচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। সংগ্রাম করেছো আরও সংগ্রাম করতে হবে। তোমরা নিজের হাতে কাজ করবে কেউ তোমাদের আদেশ দেবে বা অর্থ সাহায্য করবে সে আশা তোমরা করোনা। কারণ বর্বর খান বাহিনীর বাংলার সকল সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে এবং ধ্বংস করে রেখে গেছে সব কিছু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহান নেতা তার বাণী সব সময় স্মরণ রাখবে। আমাদের জীবনে এমন নেতা কোনদিন পাইনি যিনি প্রধানমন্ত্রির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও বাংলার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এক মন এক প্রাণ হয়ে গেছেন। তিনি জনগণের বন্ধু, তাঁর প্রতিটি কথা বাংলার মানুষের অন্তরের কথা। বাংলার মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার সঙ্গে জড়িত তার জীবন।

হাসানের কথাগুলো তার সহকর্মীদের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ দান করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো সে। বলে হাসান—বঙ্গবন্ধু বলেছেন শোষনমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। তোমরা তার এই কথাটা মুহূর্তের জন্য ভুলবেনা যেখানেই দেখবে দুর্নীতি আর শোষণ সেখানেই তোমরা রুখে দাঁড়াবে অন্যায়কে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেনা। হাঁ, আরও একটি কথা সব

সময় খেয়াল রাখবে যে, তোমার পিতা হলেও ক্ষমা নেই যদি সে অন্যায় করেন। দেশ থেকে অন্যায়কে নিঃশেষ করতে হবে, মুছে ফেলতে হবে সমস্ত গ্লানি। তবেই বাংলাদেশ হবে সুন্দর সার্বভৌম এক রাষ্ট্র। মান সম্মান নিয়ে কেউ কোনদিন আত্মগর্বে গর্বিত হবে না, সবাই মনে করবে আমরা মানুষ। তোমাদের মধ্যে থাকবেনা কোন জাতিভেদ, থাকবে না ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকবেনা সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার। একই দেশের মানুষ তোমরা, সবাই তোমরা ভাই ভাই। হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যাবে পরের দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনাকে নিজের বলে গ্রহণ করবে। পরের সাহায্যে আত্মউৎসর্গ করবে। তোমরা তো জানো খান বাহিনী আমাদের বাংলাদেশের সমস্ত কলকারখানা, বড় বড় পুল সাঁকো, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এগুলো তোমাদের গড়তে হবে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে সব কিছু। তোমরা সবাই মিলে যদি সরকারের কাছে এ সব ব্যাপারে দাবী জানাও তাতে কোন ফল হবে না কারণ বাংলাদেশ সরকার আজ নিঃস্ব। তবু যতদূর সম্ভব দেশকে আবার গড়ে তোলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের জনগণ যেন কষ্ট না পায় সে জন্য বঙ্গবন্ধুর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। তিনি পরিশ্রম করে চলেছেন। বাংলার জনগণের জন্য তিনি নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তোমরাও বাংলার মানুষ, তোমাদের মহান নেতার আদর্শকে গ্রহণ করে নিজেদের দেশ গড়ার কাজে উৎসর্গ করে দাও।

কথাগুলো বলতে বলতে ক্যাপ্টেন হাসানের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠে। নিজ হাতে সে কোদাল চালিয়ে মাটি কাটছিলো।

এগিয়ে আসে ফরিদ—হাসান ভাই কোদালটা আমাকে দাও, তুমি তাবুতে গিয়ে বিশ্রাম করোগে বড্ড রোদ.....

হাসলো হাসান, ডান হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বললো—ফরিদ আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হইনি। এর চেয়ে বেশি পরিশ্রম করা আমার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া তোমরা বাচ্চা ছেলেরা কাজ করে চলেছো আর আমি যাবো বিশ্রাম করতে এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন হাসান আর ফরিদ যখন কথা হচ্ছিলো তখন হীরা একটা তরুণকে সঙ্গে করে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। বলে হীরা—এই যুবকটি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করবে বলে এসেছে।

হাসান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায় তরুণটির মুখের দিকে তারপর বলে—পারবে কোদাল চালাতে?

তরুণটি জবাব দেয়—পারবো।

ফরিদ বলে উঠে—ও পারবে বলে মনে হয়না।

তরুণটি একটু রাগত ভাব নিয়ে বলে—তোমরা যদি পারো আমি কেনো পারবোনা। আমি কি মানুষ না?

হাসান হেসে বললো—নিশ্চয়ই তুমি মানুষ এবং পারবে! যাও ফরিদ তোমরা কাজ করোগে। হীরা একে একটি কোদাল দাও।

হীরা একটি কোদাল এনে দিলো।

হাসান বললো—তোমার নাম কি তাতো বললেনা?

তরুণটি জবাব দিলো—শামীম।

চমৎকার নামটা। বেশ এই নাও—হীরার হাত থেকে কোদালটা নিয়ে শামীমের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

শামীম কোদাল হাতে নেয়।

হীরা আর ফরিদ চলে যায় নিজেদের কাজে।

শামীম কোদাল চালায়।

হাসান কোদাল দিয়ে মাটি কেটে চলেছে।

অল্পক্ষণে হাঁপিয়ে পড়ে শামীম।

হাসান মৃদু হেসে বলে—বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছো, যাও তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করোগে।

না আমি যাবোনা। তাছাড়া হাঁপিয়েও পড়িনি মোটেই।

বেশ কাজ করো।

শামীম শেষ পর্যন্ত কাজ করে চললো।

অনেক ছেলে, অনেক যুবক, চাষী বৃদ্ধ এসে কাজে যোগ দিয়েছিলো কাজেই সন্ধ্যা নাগাদ সাঁকোটা তৈরি হয়ে গেলো।

সবাই ফিরলো হলুদখালি ঘাঁটি অভিমুখে।

শামীমা তার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য হাসানের অনুমতি চাইলো, হাসান বললো যাও।

পরদিন আবার এলো শামীমা।

হলুদখালির মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ওর চমৎকর ব্যবহারে খুশি হলো। ছেলেরা তার বয়সের অনুপাতে কাজ করে বেশি। তাছাড়া ওর সুন্দর চেহারা আকৃষ্ট করলো সবাইকে।

সেদিন শিবপুরে সবাই গেলো সেখানের গরিব চাষীদের বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর মেরামত করে তাদের মাথা গোজার আশ্রয় করে দেবার জন্য তারা ক'দিন থেকে অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছে।

আজ শামীমও গেলো তাদের সঙ্গে।

হাসান নিজের হাতে দা কুড়াল নিয়ে বাঁশ কেটে খুটি তৈরি করে দিচ্ছে।

অন্যান্য সবাই কেউ গর্ত খুড়ছে, কেউ চালা তৈরি করছে। কেউ বা কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। শিবপুরের প্রায় পুরুষদের হত্যা করেছে খান বাহিনী। যারা বেঁচে আছে শুধু নারী আর শিশু। এরা তো পারেনা ঘর-দোর

তৈরি করে নিতে। কাজেই মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা এসেছে তাদের পোড়া বাড়ি ঘর মেরামত করে দিতে।

হাসান খুঁটি তৈরি করে দিচ্ছিলো শামীম সে গুলোকে গুছিয়ে রাখছিলো।

এমন সময় একটা বৃদ্ধা পিছন থেকে এসে হাসানকে ধরে ফেলে—বাবা জলিল তুই এখানে কাজ করছিস আর আমি তোকে কত জায়গায় খুঁজে মরছি। বাবা—বাবা জলিল.....কেঁদে উঠে বৃদ্ধা হাঁউ মাঁউ করে।

কয়েকজন ছেলে দ্রুত এগিয়ে আসে বৃদ্ধাকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

হাসান বলে উঠে—থাক ওকে ছাড়াতে চেষ্টা করোনা। নিশ্চয়ই খান সেনারা ওর ছেলেকে হত্যা করেছে।

একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলো ভীড় ঠেলে, বললো সে—ওর একমাত্র ছেলে ছিলো জলিল, তাকে খান বাহিনী ওরই সম্মুখে গুলি করে হত্যা করেছিলো তারপর থেকে ও পাগল হয়ে গেছে। ছেলেটি বড় সুন্দর ছিলো তাই আপনাকে দেখে ও অমনভাবে ধরে ফেলেছে।

হাসান বললো—মা আমি তোমার জলিল। বলো কি নেবে?

কি নেবো? আমি রক্ত নেবো যারা আমার সোনার মানিককে হত্যা করেছে আমি তাদের রক্ত নেবো। হাসানকে মুক্ত করে দিয়ে হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করে বৃদ্ধা, মনে হয় এই মুহূর্তে যদি তাদের পায় তাহলে সে ওদের মাংস ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো টুকরো করে।

বৃদ্ধা আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব বলতে থাকে। তারপর হঠাৎ মাটিতে উঁবু হয়ে মাথা ঠুকে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমার বাবা জলিলকে এনে দাও খোদা। আমার জলিলকে এনে দাও। শুকনো মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্ত বেরিয়ে পড়লো বৃদ্ধার মাথা থেকে।

হাসান তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে তুলে নেয়, নিজের হাতে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দেয় সে। বৃদ্ধার অবস্থা দেখে হাসান ও অন্যান্যদের চোখেও পানি এসে গিয়েছিলো।

বৃদ্ধা এবার হেসে উঠলো আমার জলিল আসবে। আমার জলিল আসবে.....চলে গেলো সে সামনের দিকে।

অবাক হয়ে হাসান তাকিয়ে ছিলো আপন মনেই বললো—বর্বর জল্লাদ খান সেনাবাহিনী এমনি কত মাকে পাগল করেছে তার কোন হিসাব নাই। বেচারী মা আজ পথে পথে তার জলিলকে খুঁজে ফিরছে।

শামীম নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো হাসানের মুখের দিকে। হাসানের মাধ্যমে দেখতে পায় অদ্ভুত এক মানুষকে। যে মানুষটির তুলনা হয়না কারো সঙ্গে।

দৃষ্টি ফেরাতেই হাসানের সঙ্গে শামীমের দৃষ্টি বিনিময় হয়।

দৃষ্টি নত করে নেয় শামীম। আবার কাজে মনোযোগ দেয় সে। প্রখর রৌদ্রের তাপে মাটি যেন আগুনের মত গণগণে হয়ে উঠেছে। সাবল চালিয়ে মাটি খুঁড়ছিলো শামীম তখন।

কয়েকদিন হলো কাজ চলেছে।

অনেকগুলো বাড়িঘর আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লোকজন আবার তাদের বিধ্বস্ত বাড়িতে বাসা বাঁধছে। দুটো হাঁড়ি কুঁড়ি কিনে আবার তাতে রান্না চাপিয়েছে।

শিবপুর, মধুপুর, বাসব নগর, কাজল পাড়া এমনি আরও কতকগুলো গ্রাম একেবারে যেগুলো খান সেনা বাহিনী ধ্বংস করে ফেলেছিলো সেগুলো আবার গড়ে উঠলো। ক্যাপ্টেন হাসান ও বাংলার ছেলেরা মিলে এসব গ্রাম গুলোকে আবার তারা জাগ্রত করে তুললো। অবশ্য এরজন্য প্রত্যেককে অবিরাম পরিশ্রম করতে হলো। স্বার্থ ত্যাগ করে সবাই এগিয়ে এসেছিলো ক্যাপ্টেন হাসানের ডাকে। সে বলেছিলো—আমার ভাইরা তোমরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বৃষ্টি আর বন্যার পানিতে ভিজে রৌদ্রে পুড়ে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য লড়েছো। বাংলাকে রক্ষার জন্য বাংলার মানুষকে বাঁচাবার জন্য তোমরা যা করেছো ইতিহাসের পাতায় তা চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। তোমাদের এই ত্যাগ কোনদিন কেউ ভুলবেনা। অতীতে একদিন সবাই তোমরা হারিয়ে যাবে কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে তোমরা বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। আমার মুক্তি পাগল ভাইরা তোমরা যেমন প্রাণ দিয়ে দেশকে শত্রু মুক্ত করেছো তেমনি এখন অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ গড়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করো। বাংলার প্রতিটি মানুষ তোমাদের আপন জন। কাজেই তোমরা সবাই সকলের মঙ্গল কামনা করবে এবং সবাই মিলে কাজ করে যাবে।

মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ক্যাপ্টেন হাসানের কথাগুলো অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়ে গ্রাম বাসীদের সর্বভাবে সহায়তা করেন।

অবিরাম পরিশ্রম করে চলে ক্যাপ্টেন হাসান ও তার দলবল শামীম কিন্তু সব সময় রয়েছে তাদের সঙ্গে অবশ্য গোটাদিন সে এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করে সন্ধ্যায় সে ফিরে যায় নিজের বাড়িতে।

কাজের ফাঁকে এক সময় ক্যাপ্টেন হাসান বললো—আজ রাতে তোমরা প্রস্তুত থাকবে হাতীমারী বিহারী কলোনীতে হানা দিতে হবে। সেখানে এখনও কিছু সংখ্যক খান সেনা আত্মগোপন করে আছে।

সবাই কথাটা শুনে বিস্ময়ে চমকে উঠলো।

একজন বললো—হাসান ভাই আশ্চর্য এখনও হাতীমারী কলোনীতে খান সেনা আত্মগোপন করে আছে বলো কি?

হাঁ সত্য। তাছাড়া সেখানে নাকি এখনও অনেক অস্ত্র শস্ত্র আছে। সেখানে কোন এক গুদামে অনেকগুলি মেয়ে মানুষকে এখনও আটক রাখা হয়েছে। আজ রাতের অন্ধকারে আমি হাতীমারী বিহারী কলোনী ঘেরাও করবো। তোমরা সাহায্য করবে আমাকে।

এক সঙ্গে বলে উঠে সবাই—হাসান ভাই আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা সবাই মিলে আপনাকে সাহায্য করবো।

হাসান হাসি মুখে বললো—তোমাদের কথায় আমি খুশি হলাম।

রাত্রির অন্ধকারে ক্যাপ্টেন হাসান যখন তার ড্রেস পরে নিচ্ছিল তখন শামীম এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

হাসান চোখ তুলে তাকালো শামীমকে দেখে একটু অবাক হলো...তুমি আজ বাড়ি যাওনি শামীম?

না।

আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

এবার হেসে বললো—শামীম তুমি যেওনা।

কেনো?

বলছি তুমি যেওনা। হাসান তাকিয়ে দেখে নেয় এখানে আর কেউ নেই। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা তাদের তাবুতে তৈরি হচ্ছে। হাসান কয়েক পা সরে আসে শামীমের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—সত্য তোমার আত্মত্যাগ আমাকে মুক্ত করেছে শামীমা।

বিস্ময় ভরা চোখ তুলে তাকায় শামীম, বলে আমার নাম শামীমা নয় শামীম।

হেসে বলে হাসান...সবার চোখে ধূলো দিতে পারো কিন্তু আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না। শামীমা তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, তোমার ছদ্মবেশ নিখুঁত হয়েছে। কিন্তু কেনো তোমার এ আত্মগোপনতা জানতে পারি কি?

এবার শামীম বলে—শুধু ক্যাপ্টেন হাসানকে আবিষ্কার করাই ছিলো আমার মূল উদ্দেশ্য। তাই আমি পুরুষের ছদ্ম বেশে এসেছিলাম আপনার দলে যোগ দিতে। কিন্তু আপনি কেনো আমার কাছে আত্মগোপন করেছিলেন বলুনতো?

হাসলো হাসান, তার হাসির মধ্যে গভীর এক রহস্য পূর্ণ ভাব ফুটে উঠলো। কোন জবাব দিলো না সে শামীমের প্রশ্নের। কোমরের বেল্টটা বাঁধতে বললো হাসান—শামীম বলেই আমি তোমায় ডাকবো। শোন আজ তুমি আমাদের সঙ্গে যেওনা। কারণ সেখানে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

বেশ আপনার কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমাকে আপনি কোনদিন ঠেলে দিবেন না। আমি সবার সঙ্গে মিশে দেশ গড়ার কাজ করতে চাই।

শামীম তোমার কথা শুনে সত্যি আমি যার পর নাই খুশি হলাম। কোন দিন তুমি আমার কাছে অবহেলা পাবে না। যাও এবার তুমি বাড়ি ফিরে যাও শামীম, কাল আবার দেখা হবে।

আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো—হাসান ভাই বলে ডেকো।

বেশ তাই ডাকবো।

শামীমা দীপ্ত দৃষ্টি মেলে তাকায় একবার ক্যাপ্টেন হাসানের মুখে তারপর বেরিয়ে যায় সে তাবু থেকে।

বাড়ির পাশে এসে পুরুষের বেশ পরে ফেললো শামীমা তারপর পা টিপে টিপে প্রবেশ করলো অন্ত পুরে। নিজের ঘরের দরজা খুলে যেমন সে ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে অমনি রুদ্র মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে এলো শামীমার ভাবী কুলসুম। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এতোরাত কোথায় ছিলি হারাম জাদী? লজ্জা করেনা এ বাড়িতে ঢুকতে? এগিয়ে গিয়ে বজ্র মুষ্টিতে চুল ধরে টেনে বের করে আনে ঘর থেকে—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শয়তানী! এ বাড়িতে তোর জায়গা হবে না। ধাক্কা দিয়ে উঠানে ফেলে দিলো কুলসুম শামীমাকে।

উঠানে একটা ইট পড়ে ছিলো, শামীমার ললাট কেটে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

এতক্ষণে কুলসুমের বড় ছেলে জেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করে—এতোক্ষণে বুঝি নবাব জাদী বাড়ি ফিরলো?

হাঁ দেখিসনা চোরের মত চুপি চুপি বাড়ি ঢুকছিলো। বের করে দে, বাড়ি থেকে বের করে দে আমজাদ।

আমজাদ এগিয়ে এসে পা দিয়ে একটা লাথি দিলো শামীমার পাঁজরে। তারপর বললো—চলো মা ও এখানেই পড়ে থাক। শোবে চলো।

পুত্রের কথায় কুলসুম বললো—হারাম জাদী আবার যদি বাড়ি থেকে বের হবি তা হলে.....কথা শেষ না করেই পুত্রের সঙ্গে শোবার ঘরে চলে যায়।

অন্ধকার উঠানে পড়ে পড়ে কাঁদে শামীমা, কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে চোখে মুখে প্রবেশ করে। হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে কিন্তু এতো বেশি রক্তপাত হচ্ছিলো তাতে হাত জামা কাপড় ভিজে যায়।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে এক সময় উঠে দাঁড়ায় শামীমা। নিজের ঘরে প্রবেশ করে অন্ধকারেই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে বালিশটা রক্তে ভিজে উঠছে। আজ নতুন নয় এমনি অবস্থা তার ছোট বেলা থেকেই। কত মার সে খেয়েছে তার ভাবীর হাতে, দেহের কত জায়গা না কেটে গেছে ওর কিন্তু শামীমা কোনদিন প্রতিবাদ করেনি। সে জানে এ পৃথিবীতে তাকে দয়া করার মত কেউ নেই; পালিয়েই বা কার কাছে যাবে। কে তাকে আশ্রয় দেবে। মার গাল খেয়েই শামীমা রয়ে গেছে ভাই ভাবীর সংসারে।

ভাই তার মায়ের পেটের সন্তান নয়। ভাবীও তার আপন জন নয় কাজেই শামীমা কারো কাছে পায়নি এতোটুকু স্নেহ বা আদর। মা বাবা তো ছোট বেলাতেই চলে গেছে, স্নেহ ভালবাসা কি জিনিস জানে না শামীমা। এ অবস্থার মধ্যে শামীমা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলো কিছু। এজন্যও তাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কতদিন স্কুল থেকে এসে দেখেছে তার জন্য কিছু খাবার নেই। অথচ ভাই-এর ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকতো। শামীমা নিজের জন্য ভাবতোনা বেশি ভাবতো ছোট ভাই সিমুর জন্য সে খিদে সহ্য করছে কিন্তু সিমু সহ্য করতে

পারে। কোন কোন দিন অল্প কিছু খাবার থাকতো। শামীমা নিজে না খেয়ে ভাইকে খাইয়ে দিতো। নিজে এক গেলাস পানি খেয়ে নিতো।

অন্য একটি বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলো সিমু, তার কান্নার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠবে তাই জোরে কাঁদেনা শামীমা। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

❑

হাতীমারী কলোনী।

কতকগুলো অবাঙ্গালী বসে বসে গোপনে দরবার করছে। তাদের মধ্যে আছে পনেরো জন খান সেনা। এই খান সেনাদেরকে অবাঙ্গালীরা লুকিয়ে রেখেছে গোপনে। রিয়াজ আলী ও আরও কয়েকজন দালাল ছিলো এদের সহায়ক। অবাঙ্গালীদের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী দালাল এখনও এদের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছে। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও এরা বেশ আরামেই আছে, কারণ খাদ্য পানীয় সব কিছু পাচ্ছে। এমন কি কতকগুলো অসহায় বাঙ্গালী তরুণীকে একটা গুদামে আটক করে রেখেছে তাদের উপর চলেছে খুশিমত পাশবিক অত্যাচার।

আজকের বৈঠক রিয়াজ আলীও তার সঙ্গীদের হত্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন হাসান ও তার দলবল এসে আচমকা ঘেরাও করে ফেলে সমস্ত কলোনীটা। আজ হাসানের সঙ্গে আছে রহমান ও তার দলবল। সকলের হাতে অস্ত্র বর্শা, বল্লম, ছোরা, বন্দুক ও রাইফেল? ক্যাপ্টেন হাসানের হাতে রিভলভার।

এমন সতর্কতার সঙ্গে হাসানের দল কলোনী ঘেরাও করলো একজনও কলোনী ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলোনা। মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা অস্ত্র হাতে কলোনীর চারপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্যাপ্টেন হাসান হাতীমারী কলোনী ঘেরাও করার পূর্বে হাতিমারীর পুলিশ অফিসে জানায় পুলিশ সুপারকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলো। পুলিশ সুপারও দু'জন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়েছিলো সে উদ্দেশ্যে, ওদের বন্দী করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।

হাসানের শরীরে আজ জমকালো পোশাক নয় মুক্তি বাহিনীদের ক্যাপ্টেনের পোশাক ছিলো। ওকে আজ বড় সুন্দর লাগছে।

কলোনী ঘেরাও করার পর ক্যাপ্টেনের সুপার সহ কলোনীর ভিতরে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কলোনীর ভিতর থেকে গোলাগুলি নিক্ষেপ।

পাল্টা জবাব দিতে লাগলো হাসানের দল।

ক্যাপ্টেন হাসান পুলিশ সুপার এবং রহমান গা ঢাকা দিয়ে এগুতে লাগলো। কয়েকজন পুলিশও আছে তাদের সঙ্গে।

যে কক্ষমধ্যে অবাঙ্গালী নেতাগণ ও খান সেনাবাহিনীর পনেরোজন আর বাঙ্গালী কয়েকজন দালাল বসে সলা পরামর্শ করছিলো ক্যাপটেন হাসান সব বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে দলবল সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করে।

শুরু হয় তুমুল লড়াই।

ক্যাপটেন হাসান দক্ষতার সঙ্গে সবাইকে পরাজিত করে। বন্দী করে সব গুলোকে।

হাতীমারীর পুলিশ সুপার এবং পুলিশ অফিসারগণ ক্যাপটেন হাসানের যুদ্ধ কৌশল লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে যায়।

অবাঙ্গালী প্রায় বিশ জন, পনেরো জন খান সেনা, এবং বাঙ্গালী দালাল ছয় জন বন্দী হলো।

এবার খানা তল্লাসী চললো কলোনীর মধ্যে। ক্যাপেটেন হাসান জানতো এই কলোনীর মধ্যেই কোন গোপন স্থানে আছে অগণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং কোন গোপন গুদামে আছে কিছু সংখ্যক অসহায়া তরুণী।

হাসান ও তার দলবল যার সঙ্গে কলোনীর ভিতরে প্রবেশ করেছিলো তারা সবাই সন্ধান চালাতে লাগলো। একটা ভাঙ্গাচুরা দালানের মধ্যে পাওয়া গেলো বিপুল অস্ত্র। পুলিশ সুপার এসব অস্ত্র উদ্ধার করে অফিসে নিয়ে যাবার জন্য আর একজন পুলিশ অফিসারকে আদেশ দিলেন তিনি নিজে ক্যাপেটেন হাসানের সঙ্গে থেকে দেখতে লাগলেন।

ক্যাপটেন হাসানকে যতই দেখছেন ততই যেন বিস্মিত হচ্ছেন। এমন যুবক তিনি এর পূর্বে দেখেন নাই। যার মধ্যে এমন কর্মদক্ষতা রয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই গুদামখানা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো হাসান। একটা বদ্ধ গুদামের মধ্যে প্রায় বিশ পঁচিশজন তরুণীকে এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পেলো তারা।

ক্যাপটেন হাসান ও তার সঙ্গীদের দেখে তরুণীগুলো লজ্জায় মুখ নত করে নিলো কেউ বা মুখ ঢেকে ফেললো দু'হাতের মধ্যে।

হাসান লক্ষ্য করলো তরুণীগুলো প্রায়ই ষোল থেকে বিশ বাইশ বছরের মধ্যে। কয়েকজন পল্লী তরুণী ছাড়া সবাইকে শিক্ষিত বলে মনে হলো। এ সব তরুণীদের মধ্যে অনেককেই গর্ভবতী অবস্থায় দেখা গেলো।

হাসান ও তার সঙ্গীদের দেখে তরুণীদল কাঁদতে শুরু করলো। লজ্জায় ক্ষোভে কেউ যেন তারা মুখ দেখাতে পাচ্ছিলোনা। হাসান তরুণীদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলো হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করলো, সে নিজেও যেন

এদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলোনা লজ্জা বোধ হচ্ছিল। নিজকে সহজ করে নিলো হাসান তারপর বললো—বোন তোমরা কেঁদনা, এখন তোমরা সবাই মুক্ত? আর কোন পিশাচ তোমাদের উপর অত্যাচার করতে সক্ষম হবে না।

তরুণীদের একজন বলে উঠলো—এ মুখ আমরা আর কাউকে দেখাতে চাইনা। আমাদের মেরে ফেলুন। আমাদের হত্যা করুন.....আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মেয়েটি।

পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য সবাই যেন হতবাক হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থায় তারা কোনদিন দেখেনি। তরুণীদের চুল এলোমেলো, দেহের বসন ছিন্নভিন্ন। চিবুকে গন্ডে গলায় কাঁধে পিশাচ খান হানাদারদের দংশনের চিহ্ন। বর্ণনাতীত অবস্থা এক একজনের।

হাসান বললো—তোমাদের এ অবস্থার জন্য তোমরা তো দায়ী নও? কেনো তোমরা নিজেদের জীবন বিনষ্ট করতে চাও? তোমরা আমাদেরই মা বোন, তোমরা ফিরে চলো।

পুলিশ সুপার লোকমান হোসেন বললেন—হাঁ সমাজ আপনাদের স্থান দিতে বাধ্য বঙ্গবন্ধু বলেছেন—আপনারা নারী সমাজে শীর্ষ স্থানীয় কারণ আপনাদের ইজ্জতের বিনিময়ে তো আমরা লাভ করেছি আমাদের বাংলাদেশ। চলুন আপনারা, আমরা সমাজে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করবো।

পুলিশ সুপার মিঃ হোসেন হাতীমারী কলোনী থেকে অবাঙ্গালী দালালগণ সহ পনেরোজন খান সেনা এবং ছয়জন বাঙ্গালী দালালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললো। আর নির্যাতীতা তরুণীদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলো ক্যাপটেন হাসান। কথায় কথায় জানতে পারলো হলুদখালি চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা বৌ আছে এই তরুণীদের মধ্যে।

ক্যাপটেন হাসান চৌধুরী সাহেবকে ডেকে পাঠালো হলুদখালি ঘাঁটিতে।

চৌধুরী আরিফ আহম্মদ এসে হাসান তাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনার পুত্রবধূ কোথায়?

আরিফ আহাম্মদ কথাটা শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন পরে বললেন—বৌমা এখন মায়ের বাড়িতে।

হাসানের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—মিথ্যা কথা।

নানা সত্যি বলছি.....আমতা আমতা করে বলে চৌধুরী সাহেব।

হাসান গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনি না হজ করে হাজী হয়ে এসেছেন অথচ এতো বড় মিথ্যা বলতে আপনার বাঁধলোনা? এবার ডাকলো—হীরা।

তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো হীরা—হাসান ভাই বলো?

ওকে নিয়ে এসো।

হীরা চলে গেলো একটু পরে একটি ঘোমটা ঢাকা তরুণীর সহ উপস্থিত হলো তাদের সম্মুখে।

হাসান সরে এসে বাম হাতে আলগোছে তরুণীর ঘোমটা খুলে ফেললো বললো—দেখুন একে চিনতে পারেন কিনা?

চৌধুরী সাহেব তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বললো—এ্যাঁ তুমি বেঁচে আছো?.....

হাসান ব্যাঙ্গ পূর্ণ হাসি হেসে বললো—ও আপনি তা হলে ভেবেছিলেন আপনার পুত্র বধুর মৃত্যু ঘটেছে? তবে মিথ্যা কথা বললেন কেন আপনার পুত্র বধু নাকি তার বাপের বাড়ি আছে? হাসানের মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠলো বললো—খান সেনাবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গেছে এ কথাটা লোকে জানলে আপনার মান সম্মান সব খোয়া যাবে। এ জন্য আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। ভেবেছেন তার মৃত্যু ঘটেছে, আপনিও কলঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। বলুন এ আপনার পুত্র বধু কি-না? বলুন চুপ করে রইলেন কেনো? বলুন?

হাঁ এ আমার পুত্র বধু।

সে নিজের ইচ্ছায় নয় বর্বর খান সেনা বাহিনীরা তাকে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। তার নিজের কোন দোষ নাই কোন অপরাধ নাই। অথচ আপনি সেই নিষ্পাপ নিরোপরাধ পুত্র বধুর মৃত্যু কামনা করেছিলেন। দেখুন চৌধুরী সাহেব আপনার পুত্র বধুকে আপনি ঘরে নিয়ে যান।

চমকে চোখ তুলে তাকায় চৌধুরী সাহেব।

হাসান বললো—কি অমন চমকে উঠলেন কেনো?

চৌধুরী সাহেব মাথা চুলকে বললেন—আমাদের সমাজ আছে.....

কথা শেষ করতে দেয়না হাসান কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠে—রেখে দিন আপনাদের সমাজ। সমাজ কারা তৈরি করেছে? আপনারাই তো সমাজের অধিপতি। শুনুন সমস্ত সমাজ ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলুন। সমাজ আমরা মানি না। নিয়ে যান আপনার পুত্র বধূকে' কন্যার স্নেহে বুকে তুলে নেন। আজ এর মত অসহায় আর কেউ নেই।

চৌধুরী সাহেব তবু মাথা নিচু করে রইলেন।

ক্যাপ্টেন হাসান বললো আবার—উঠুন নিয়ে যান ওকে সঙ্গে করে। এ ব্যাপারে সমাজে যদি কোন কথা উঠে তা হলে আমরা তাদের সায়েস্তা করবো। যান নিয়ে যান। হাঁ শুনুন শুধু আপনি নন যে সব মা বোন খান

সেনাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের সবাইকে সমাদরে সমাজে স্থান দিতে হবে।

চৌধুরী সাহেব বললেন—কিন্তু.....

কোন কিন্তু নয় একটি কথাও আমরা শুনবো না। যান নিয়ে যান। মাসুমা যাও বোন তোমার শ্বশুরের সঙ্গে যাও।

হাসানের কথা অমান্য করতে পারেনা চৌধুরী সাহেব। তিনি পুত্র বধু মাসুমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলেন বাড়ির দিকে।

পরদিন আরো কয়েকজন অভিভাবককে ডেকে তাদের কন্যাদের সমর্পণ করলো হাসান। সবাইকে বুঝিয়ে দিল সে—এই সব অসহায়া মহিলাদের আপনারা যদি সমাজে স্থান না দেন তা হলে এরা লজ্জায় ক্ষোভে মৃত্যুসম অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বাংলার স্বাধীনতায় এই সব মা বোনদের দান সবচেয়ে বড়। কারণ নারীর ইজ্জৎ অমূল্য রত্নের চেয়েও মূল্যবান। এ সব মা বোনরা নিজেদের অমূল্য ইজ্জৎ বিলিয়ে দিয়ে বাংলা জননীকে মুক্ত করেছে কাজেই এরা অবহেলার পাত্রী নয়। আপনারা যার কন্যা, যার পুত্রবধু, যার স্ত্রী, সসানন্দে ঘরে নিয়ে যান। আপনারা এদের আদর যত্ন করবেন এরা যেন বুঝতে না পারে তারা লাঞ্ছিতা নির্যাতীতা।

অভিভাবকগণ ক্যাপটেন হাসানের কথাগুলে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন সত্যতো এই সব মহিলারা কোন অপরাধে অপরাধী নয়। স্বইচ্ছায় এরা যায়নি এদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো জোর পূর্বক। এদের আটক রেখে ওরা এদের উপর চালীয়েছে খুশীমত অত্যাচার। প্রায় মহিলার অবস্থাই সঙ্কটপূর্ণ? কয়েকজন ছাড়া প্রায়ই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা।

হাসান বললো—আপনাদেরই কন্যা মা বোন এরা। আপনারা এদের ফেলতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন কাজেই আপনাদের কোন অসুবিধা হবেনা। আপনারা শুধু এদের সমাজে স্থান দেন।

হাসানের কথায় কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারেনা। যার যার আত্নীয়দের তাঁরা নিয়ে যান বাড়িতে। কিন্তু এ একটি তরুণীর পক্ষ থেকে কেউ আসেনা।

তরুণীটি নীরবে রোদন করে চলছে।

হাসান তার কাজ শেষ করে ফিরে আসে তাঁবুর মধ্যে তরুণীটিকে দেখে সে বুঝতে পারে তরুণীটি শিক্ষিতা। হাসানকে তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে।

হাসান ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কোমল কণ্ঠে বলে—বোন কেঁদোনা। আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো জবাব দেবে তো?

দেবো। বললো তরুণী।

খান সেনারা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার পূর্বে কার বাড়ি ছিলে শ্বশুর বাড়ি না বাপের বাড়ি?

বিয়ে আমার হয়নি।

হাসান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিমেলে তাকালো তরুণীর দিকে। দীর্ঘদিন খান সেনাদের কবলে বন্দী থেকে অযত্নে অনাচার অত্যাচার নিষ্পেষিতা হলেও তরুণীটিকে দেখলে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দীর্ঘ সুন্দর দেহ মাথায় রাশি কৃত কালো চুল রক্তাব গণ্ড। ডাগর ডাগর দুটি চোখ। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

দেহের বসন ছিন্ন ভিন্ন হলেও সে বসন যে একদিন বেশ মূল্যবান ছিলো তা বেশ বোঝা যায়। গলায় এবং গালের কয়েক স্থানে পাপাচার খান হানাদারদের নখরের চিহ্ন ঠিক চাঁদে কলঙ্কের মত দাগ।

ক্যাপটেন হাসানও চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। ওর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো তারপর বললো—তোমার বাড়ি কোথায় বোন? বলো আমরা সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

বাড়ির ঠিকানা আমি বলবো না।

সে কি? তাহলে কেমন করে তোমাকে আমরা পৌঁছে দেবো।

বাড়ি আমি যাবো না।

এ তুমি কি বলছো?

হাঁ আমি জানি আমার জন্য সে পথ বন্ধ। কারণ আমার বাবা আমাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবেন না। আমার অনেকগুলো বোন আছে। আমাকে বাড়িতে আশ্রয় দিলে তাদের কারো বিয়ে হবে না। সমাজ আমার বাবাকে এক ঘরে করবে।

হাসলো হাসান, তারপর বললো—সমাজ! কোন সমাজ আমরা মানি না। মানুষ সমাজে মানুষের অধিকার পাবে এই আমরা জানি।

তাছাড়া আমি মা হতে চলেছি.....

এ আর এমন কি কথা।

না না তা হয় না আমাকে আপনারা পারবেন না বাড়ীতে নিয়ে যেতে। আমি এ মুখ কাউকে দেখাতে পারবো না। আমি আত্মহত্যা করবো। আমি আত্মহত্যা করবো.....আকুলভাবে কাঁদতে থাকে তরুণীটি।

হাসান সান্ত্বনার স্বরে বললো—কেঁদোনা বোন। আত্মহত্যা তোমার করতে হবে না। তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেবো না আমরা।

আমার বাবা ব্রাহ্মণ। আপনি জানেন না হিন্দু জাতীর মধ্যে ব্রাহ্মণদের কন্যাদায় কত কঠিন। আর আমার এই কলঙ্কময় জীবন...

বুঝেছি। গম্ভীর কণ্ঠে বললো হাসান। মাথা নিচু করে কিছু ভাবলো তারপর বললো—তোমার এ অবস্থার পূর্বে কি করতে বা কোথায় ছিলে যদি কোন আপত্তি না থাকে বলবে? হাঁ তার পূর্বে তোমার নামটা জানতে চাই?

আমার নাম সাবিত্রী। বাবা প্রফেসার ছিলেন এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা পাঁচ বোন তিন ভাই। বাবার পেনশানের সামান্য টাকায় সংসার চালানো কঠিন। তারপর আমরা তিন বোন বিবাহ যোগ্যা। আমি বি, এ পাশ করে বাবার দায়িত্বভার কমানের জন্য কোন এক স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতাম। সংসার খরচ চালিয়ে কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করে রাখতাম বাবাকে কন্যাদায়ে সাহায্য করবো বলে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে আমিও চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে আসি। সংসারে ভীষণ অভাব অভিযোগ দেখা দেয়। এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াই কিন্তু পেটের তাগিদে আবার আমাকে কাজে যোগ দিতে হয়। স্কুল করছি এমন এক দিনে একজন মেজর আর কয়েকজন খান সেনা সেই স্কুলে গিয়ে হাজির। মেজর আমাকে দেখেই কেমন যেন কুৎসিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তারপর স্কুলের হেড মাষ্টারকে বললো; আমাকে তার বাংলোয় পাঠিয়ে দিতে। আমি উর্দু না জানলেও বুঝতে পারলাম মেজরের কথাগুলো। মাষ্টার যদি তার কথা না শোনেন তবে তাকে হত্যা করা হবে এবং স্কুলটি ধ্বংস করে ফেলা হবে বলে ভয় দেখলো। থামলো সাবিত্রী।

ক্যাপটেন হাসান চোখ তুলে তাকালো সাবিত্রীর মুখের দিকে।

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে, বললো কে—আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, না আমাকে তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তৎক্ষণাৎ স্কুল কক্ষ ত্যাগ করতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না কয়েকজন খান সেনা আমার সম্মুখে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। আমি দিশে হারার মত বৃদ্ধা মাষ্টারের পিছনে এসে লুকোলাম। এবার মেজর এসে আমার হাত ধরে ফেললো। আমি মেজরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তা ধস্তি শুরু করলাম। সেই সময় বৃদ্ধ-মাষ্টার আমাকে রক্ষা করার জন্য মেজরের হাত থেকে আমার হাত খানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। মেজর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সে খান সেনাদের ইংগিৎ করতেই খান সেনারা তাঁর দেহটাকে বেয়োনটের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললো। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য.....সাবিত্রীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেলো, সে যেন এই মুহূর্তে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

হাসান মনোযোগ দিয়ে শুনছে। বললো—তারপর?

সাবিত্রী আবার বলতে শুরু করলো—বৃদ্ধ-মাষ্টারের অবস্থা দেখে অন্যান্য কোন মাষ্টার বা কোন ছাত্রী সে কক্ষে প্রবেশ করতে সাহসী হলো না। আমি তখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য পথ খুঁজছি। যেমন পিছন দরজার দিকে এগুতে গেলাম অমনি মেজর আমাকে ধরে ফেললো। একচুল আমি নড়তে পারলামনা, আমাকে টেনে তাদের গাড়িতে তুলে নিলো। তারপর একটা বাংলোর সামনে এসে গাড়ি থামলো। মেজর আমাকে টেনে নামিয়ে নিলো। সেই বাংলোর মধ্যে নিয়ে আমাকে.....তারপর আরও কি আপনি শুনতে চান?

হাসান করুণ ব্যাথা ভরা চোখে সাবিত্রীর কোমল অসহায় মুখ খানার দিকে তাকালো।

সাবিত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হাসান এবার উঠে দাঁড়ালো, আপন মনে পায়চারী করতে লাগলো সে। কিছুক্ষণ পর ডাকলো—রুস্তম।

রুস্তম তাঁবুতে প্রবেশ করে বললো—আমাকে ডাকছ হাসান ভাই।

হাঁ! সমীর ক্যাম্পে আছে?

আছে।

আচ্ছা রুস্তম সমীর ব্রাহ্মণের ছেলে বলে শুনেছিলাম?

হাঁ সমীর ব্রাহ্মণ।

ওকে ডেকে আনো।

রুস্তম বেরিয়ে যায় একটু পরে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সমীর সহ পুনঃ প্রবেশ করে। দ্বীপ্ত উজ্জল মুখ, বলিষ্ঠ প্রসস্ত চেহারা। দাঁড়ালো রুস্তম আর সমীর হাসানের সম্মুখে। হঠাৎ অসময়ে এ তাঁবুতে কোনো তাদের ডাকা হলো জানেনা ওরা।

হাসান সমীরের পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—সমীর।

বলো হাসান ভাই?

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি যুদ্ধ করেছিলে?

হাঁ করেছিলাম। মনে মনে ভাবে হাসান তো সবই জানে তবু কেনো তাকে এ প্রশ্ন করছে। নীরবে জবাব দেয় সমীর।

হাসান বললো—তুমি বাংলার স্বাধীনতায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলে? অনেক ত্যাগ তুমি দিয়েছো যদি বলি আরো ত্যাগ তোমাকে দিতে হবে পারবে না?

শান্ত কণ্ঠে বললো সমীর—পারবো।

হাসান এবার সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো—একে তোমার বিয়ে করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সমীর ওর দিকে তাকালো, মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে।

হাসান এগিয়ে এসে সমীরের পিঠে হাত রেখে বললো—সমীর নতুন করে তোমাকে কিছু বলতে হবে না তুমি সব জানো। খান সেনাদের দ্বারা সাবিত্রী নির্যাতীতা এমন কি মা হতে চলেছে। এর বাবা গরিব ব্রাহ্মণ প্রফেসার, অনেকগুলো বিবাহ যোগ্যা বোন ঘরে আছে। কাজেই সে ঘরে ফিরে যেতে পারে না, তার জন্য তার বাপ মা ছোট বিবাহ যোগ্যা বোনদের ভবিষ্যত নষ্ট করতে পারেন না। তাই ওর একমাত্র পথ আত্মহত্যা করা। সমীর তুমি কি চাও একটি জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়? বলো?

না আমি তা চাই না।

তবে পারবে ওকে গ্রহণ করতে?

সমীর নীরব।

সাবিত্রী একবার অসহায় করুণ চোখে তাকালো সমীরের সুন্দর দীপ্ত মুখের দিকে। সমীরের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

সাবিত্রী দৃষ্টি নত করে নিলো।

হাসান বললো—মনে করো স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন তুমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলে, তেমনি আজ তুমি সাবিত্রীর মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দাও।

হাসান ভাই আপনার কথা আমি মেনে নিলাম, সমীর শান্ত কণ্ঠে বললো।

হাসান এবার সাবিত্রীর হাত খানা তুলে নিয়ে সমীরের পাশে দাঁড় করিয়ে ওর হাত খানা সমীরের হাতের উপর রেখে বললো—জানি সাবিত্রী তোমাকে পেয়ে সুখী হবে তুমি একে যত্নে রেখো ভাই।

সমীর আর সাবিত্রী নত হয়ে ক্যাপটেন হাসানের পদধূলি গ্রহণ করলো।

হাসান এক সময় সমীরকে বলেদেয় একে বাড়ি নিয়ে যাবার পূর্বে হলুদখালি হসপিটালে নিয়ে যাও। সেখানে বাংলাদেশ সরকার নির্যাতীতা মহিলাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছেন। একে ভর্তি করে দাও হসপিটালে।

সমীর মাথা নত করে সম্মতি জানায়।

❑

একা একা তাবুতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলো হাসান। মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা কোন এক জায়গায় ফাংশানে গেছে! হাসান শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো গত দিনের

কথা! সাবিত্রী আর সমীরের কথা। সমীরের মত সব ছেলে যদি এই সব অসহায় তরুণীদের বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতো তাহলে ঐ সব বিপন্না নারীরা হয়তো বেঁচে থাকার একটা পথ পেতো। কত নারী আজ খান সেনাদের দ্বারা নির্যাতীতা—তারা সমাজে স্থান না পেয়ে সব আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে! মরণ ছাড়া তাদের যেন কোন গতি নাই। .....কত কি ভাবছে হাসান এমন সময় তাবুতে প্রবেশ করে শামীমা। মুখমণ্ডল করুণ ব্যথাভরা! চোখ দুটো ছল ছল করছে।

হাসান পদ শব্দে চোখ তুলে তাকায়—আরে শামীম তুমি।

শামীমা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কোন জবাব সে দিলো না।

হাসান বিছানায় উঠে বসে বললো—বসো।

শামীমা তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

হাসান বললো—কি হয়েছে শামীমা? এ ক'দিন আসোনি কেনো? কই জবাব দাও? একি কাঁদছো? কি হয়েছে বলো? হাসান শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। চিবুকটা তুলে ধরে—একি তোমার কপালে ক্ষত চিহ্ন কেনো?

এবার শামীমা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠে—আমার ভাবী আমাকে মেরেছিলো। আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেবেনা। কড়া পাহারা রেখেছে যেন বেরুতে না পারি।

তাতে কি, ভাবী যদি বেরুতে না দেয় তাহলে এসোনা।

হাসান ভাই আপনিও আমাকে চাননা?

না—না সে কথা বলছিনা শামীমা। তুমি এলে তার যদি কোন অসুবিধা হয় তাই বলছিলাম।

অসুবিধা আমি বাড়িতে না থাকলে তার নির্যাতন চলেনা।

আমাকে যন্ত্রনা দেওয়াই হলো তার কাজ এবং এতেই তার শান্তি।

ও বুঝেছি। যেমন তোমার ভাই ছিলো নর-পিশাচ তেমনি তোমার ভাবীও নর-পিশাচী।

শামীমা চুপ করে থাকে।

হাসান বলে—বসো। ওর হাত ধরে বসিয়ে দেয় হাসান। নিজেও বসে ওর পাশে।

শামীম বলে—হাসান ভাই এ পৃথিবীতে আমাকে স্নেহ আদর করবার কেউ নেই। চিরদিন আমি ভাই ভাবীর কাছে লাঞ্ছনা পেয়ে এসেছি। আমি চাই কাজের মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দিতে। পরের উপকার করতে পারলে আমার মনে সান্ত্বনা খুঁজে পাই। কিন্তু ভাবী আমার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাসান একটু শব্দ করলো—হুঁ, তাহলে তোমার ভাবীকে শায়েস্তা করতে হয়।

না—না ভাবীর কোন অমঙ্গল আমি চাইনা। ভাবীর কোন অমঙ্গল আমি চাইনা হাসান ভাই। ভাবী ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই.....

হাসলো হাসান, বললো—বেশ তুমি যা চাও তাই হবে।

এমন সময় খলিল নামক এক মুক্তিযোদ্ধা তরুণ ও আরও কয়েকজন সেই তাঁবুতে প্রবেশ করে। তাদের মুখমন্ডলে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন হাসান বললো—হিজলা জঙ্গলে কোন এক পোড়া বাড়ির মধ্যে খান সেনা আত্মগোপন করে আছে সংবাদ পাওয়া গেছে। হাসান ভাই আপনি শীঘ্র চলুন হিজলা যেতে হবে।

এ সংবাদ তোমরা কি করে জানতে পারলে খলিল?

আমাদের বাড়ি হিজলা জঙ্গলের অদূরে পলাশপুর গ্রামে! পলাশপুরের কোন এক রাখাল হিজলা জঙ্গলে গিয়েছিলো গরু খুঁজতে। কয়েকজন খান মিলিটারী নাকি তাকে ডেকে কিছু টাকা দেয় এবং কিছু খাবার জিনিস কিনে দিয়ে যেতে বলে। সেই রাখাল ছেলে আমাকে সংবাদটা জানিয়েছে।

ক্যাপ্টেন হাসান বললো—তাহলে তো বিলম্ব করা উচিৎ নয়। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

শামীমা বলে উঠে—আজ আমিও যাবো হাসান ভাই।

তা হয় না তুমি ছেলে মানুষ.....

আমি ছেলে মানুষ নই আমাকে আজ সঙ্গে নিতেই হবে।

বেশ যাও তৈরি হয়ে নাওগে।

শামীমা বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই তৈরি হয়ে নেয়। প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটা রাইফেল।

সমীরও এসেছে সে ও আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এদের সঙ্গে রয়েছে রিভলভার।

শামীমা পুরুষের বেশে সেও অন্যান্যদের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার দীপ্ত কঠিনভাব, নারী হলেও সে কোন কাজে পিছপা হবেনা। শামীমার চুলগুলো পুরুষের চুলের মত খুব ছোট না হলেও লম্বা নয় এবং সে কারণেই তাকে মাথায় কিছু বাঁধতে হয় না। লম্বা সুঠাম চেহারা, পুরুষের পোশাকে সুন্দর মানায় ওকে। সেই কারণেই আজও কোন ছেলে তাকে মেয়ে বলে ধরতে পারেনি।

হাসান নিজেও পোশাক পরে সজ্জিত হয়ে নিয়েছে।

অল্পক্ষণেই তারা হিজল জঙ্গলের উদেশ্যে রওয়ানা দিলো। সেই রাখাল ছেলেটি অবশ্য তাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে চললো, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তারা পৌঁছলো হিজল জঙ্গলের অদূরে।

এবার হাসান সবাইকে বলে নিলো—ভাইরা তোমরা সব সময় সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হবে। হঠাৎ যদি খান হানাদার বাহিনী টের পায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

ক্যাপটেন হাসানের কথামত সবাই অস্ত্র হাতে অতি সাবধানে এগুতে লাগলো। সকলের আগে রয়েছে হাসান। তার পিছনে এবং আশে-পাশে অন্যান্য সবাই। শামীমা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য হাসানের পাশ থেকে দূরে সরে যায়নি। তার লক্ষ্য হল হাসান। শত্রু সেনারা যেন হাসানের উপর গুলি ছুঁড়তে না পারে এটাই তার ইচ্ছা।

চলার ফাঁকে একবার বললো হাসান—শামীম তুমি পিছনে যাও।

না আমি আপনার কাছে কাছে থাকবো।

বেশ যা খুশি করো।

কিছুক্ষণ চলার পর তারা পোড়ো বাড়িটা দেখতে পেলো। রাখাল ছেলেটা এখনও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তার মুখে এতোটুকু ভয়ের চিহ্ন নাই। হাসান ওকে নিজের পাশে পাশে রেখেছে। ছোট্ট ছেলে তবু তার চোখে মুখে কর্তব্যের ছাপ। চলতে চলতে বললো রাখাল ছেলেটা—ওরা আমার বাপ জানকে মেরেছিলো আমি আমি ওদের মারবো। তুমি আমাকে একটা অস্ত্র দাও ক্যাপ্টেন।

রাখাল ছেলেটা শুনেছিলো, হাসান মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা বা ক্যাপ্টেন—তাই সে হাসানের কাছে অস্ত্র চেয়ে বসলো।

হাসান হেসে বললো—তুমি ছোট ছেলে কাজেই এসব অস্ত্র চালাতে পারবে না। তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমরাই ওদের খতম করবো।

আরো কিছু চলার পর রাখাল ছেলেটা বলে উঠলো—ঐ যে সেই পোড়া বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ঐ বাড়িটার মধ্যে লুকিয়ে আছে খান সেনারা।

রাখাল ছেলেটার কথা শেষ হয় না একটা গুলি সা করে চলে যায় তাদের কানের পাশ কেটে।

হাসান সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে। নিজেও উঁচু হয়ে শুয়ে পড়ে হাসান।

ওরা শুয়ে পড়ার পরপরই আরো কয়েকটা গুলি চলে গেল তাদের উপর দিয়ে।

হাসান বললো—তোমরা সবাই বুকে ভর করে এগুতে থাকো। খান হানাদারগণ টের পেয়ে গেছে কাজেই তারা অবিরাম গুলি চালাবে। খবরদার কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবে না।

হাসানের কথামত মুক্তিযোদ্ধা তরুণ দল বুকে ভর করে রাইফেল প্রস্তুত রেখে এগুতে থাকে।

তবু গুলি আসছে।

হাসান বললো—তোমরা বনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ো। লক্ষ্য রাখবে বাঁশীর শব্দ শোনা মাত্র সবাই একত্রিত হবে।

এবার মুক্তিযোদ্ধা তরুণ দল বুকে ভর দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই এগুচ্ছে।

ওদিক থেকে গুলি—গোলা আসছে।

এবার হাসান নিজে ফাঁকা আওয়াজ করলো, একটি দু'টি তিনটি।

হাসান কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেছে। সেখান থেকে সে অবিরত গুলি ছুঁড়ছে।

খান সেনারা পাল্টা জবাব দিচ্ছে। তবে হাসান একটি গুলি ছুড়লে খান সেনাদের তরফ থেকে দশটা গুলি আসছে। অনেক এগিয়ে এসেছে হাসান।

অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দলও জঙ্গলে আত্মগোপন করে পোড়ে। বাড়ি খানার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে।

হঠাৎ গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

পোড়ো বাড়ির দিকটা সম্পূর্ণ নীরব মনে হচ্ছে।

হাসান প্রায় এসে গেছে বাড়িটার কাছাকাছি। মাঝে মাঝে সে গুলি ছুড়ছে। কিন্তু কোন জবাব আসছে না ওদিক থেকে। ততক্ষণে তার দল-বল সবাই এসে হাজির হয় তার আশে-পাশে।

হাসান এদের লক্ষ্য করে বলে—ওরা নিশ্চয়ই কোন মতলব এঁটেছে, দেখছোনা আর গুলি ছুঁড়ছে না।

সমীর বললো—হয়তো ওদের গুলি শেষ হয়ে গেছে।

খালেদ বললো—আমার মনে হচ্ছে ওরা পালিয়েছে।

হাসান বললো—তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে আসতে পারো, আমি এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলে উঠলো—আমরা সবাই যাবো।

হাসান বললো—তা হয়না যে কেউ একজন আমার সঙ্গে আসবে, হয়তো সে আর নাও ফিরে আসতে পারে। তোমরা সবাই অস্ত্র নিয়ে পোড়ো বাড়িটার চার পাশ ঘিরে রাখবে কেউ যেন পালাতে না পারে। হাসান উদ্যত

রিভলভার হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়। পিছনে এগিয়ে আসে হীরা। তার হাতে রাইফেল।

দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে যায় মৃত্যুর গুহার মধ্যে।

বিপুল উন্মাদনা নিয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে হাসানের দলবল।

পোড়ো বাড়িটার প্রত্যেকটা ভাঙ্গা-চূরা বসে পড়া ঘর তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায় হাসান আর হীরা কিন্তু কোথাও বর্বর খান হানাদারদের সন্ধান পায় না। তবে ওরা খান হানাদারদের অনেক অস্তিত্ব সেখানে দেখতে পায়, যার দরুণ বুঝতে পারে ওরা একটু আগেও এখানে ছিলো। সিগারেটের বাক্স, পোড়া অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট। বিস্কুটের খালি প্যাকেট, মাখনের টিন এমনকি অনেক কিছু নজরে পড়তে লাগলো।

কিন্তু গেলো কোথায় ওরা।

হাসান আগে পিছনে হীরা।

অতি সতর্কতার সহিত এগুচ্ছে তারা।

বাইরে হাসানের সঙ্গীরা ক্রমেই বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তারা ব্যকুল মনোভাব নিয়ে অস্ত্র হাতে প্রতিক্ষা করছে।

হাসান সম্মুখে একটা বদ্ধ দরজা দেখতে পেলো। হীরা চাপা কণ্ঠে বললো—নিশ্চয়ই এই কক্ষে কেউ আছে।

হাসান বললো—সেইরকম আমারও মনে হচ্ছে।

কথা শেষ করেই প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় হাসান সেই বদ্ধ দরজায়। এক বার দুই বার তিন বার।

দরজা ভেঙ্গে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে হাসান আর হীরা দেখলো কতকগুলো নারীর উলঙ্গ রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে মেঝেতে। এই মাত্র তাদের হত্যা করা হয়েছে।

হাসান একদণ্ড ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো তারপর ওদিকের আর একটি দরজা লক্ষ্য করে দ্রুত এগুলো হীরাও তাকে অনুসরণ করলো।

ওদিকের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। একটা পথ দেখা গেলো সোজা সামনের দিকে। পথটা সুড়ঙ্গ পথ বটে, হাসান আর হীরা এই পথে অগ্রসর হলো যদিও তারা জানে তাদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

হাসান আর হীরা যতই এগুচ্ছে ততই পথটা প্রশস্ত বলে মনে হচ্ছে। হাসান সম্মুখে, তার হাতে উদ্যত রিভলভার। আরও কিছুদূর এগুতেই দেখলো একটা বিরাট কক্ষ, কক্ষ মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন খান হানাদার আত্মগোপন করে বসে আছে।

হাসান আর হীরা রিভলভার উদ্যত করে দাঁড়ালো।

হাসান কঠিন কণ্ঠে বললো—একচুল কেউ নড়বেনা।

কিন্তু একজন খান হানাদার রাইফেল উঁচু করে সঙ্গে সঙ্গে হাসানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

হাসান চট্ করে সরে দাঁড়ায়।

গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হলো দেয়ালে।

হীরার গুলি ততক্ষণে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে সেই খান সেনাটির বুকে। একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো খান সেনাটি।

শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

এতোগুলো খান সেনার সঙ্গে হাসান আর হীরার—তুমুল যুদ্ধ চলেছে। খান সেনাদের কাছে তখন প্রচুর গুলি ছিলোনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো হাসান আর হীরার কাছে।

ওরা যখন হাসানের পায়ের কাছে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র রাখছিলো তখন হাসানের দলবল এসে হাজির হয় সেখানে। তারা গোলাগুলি শব্দে পোড়াবাড়িটার ভিতরে প্রবেশ করে এবং অগ্রসর হতে হতে শেষ অবধি সেই কক্ষে এসে হাজির হলো।

হাসান এদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে ফেলতে আদেশ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা খান হানাদারদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো।

খান সেনারা ভিজে বিড়ালের মত একেবারে চুপসে গেছে। সবাইকে বেধে নিয়ে পোড়াবাড়ির বাহিরে এসে দাঁড়ালো হাসান আর তার দলবল।

চারিদিকে জঙ্গল, কোথাও এতোটুকু ফাঁকা জায়গা নজরে পড়লোনা। সবাই মিলে খান সেনাদের ঘিরে রেখেছে।

হাসান বললো—এইসব বর্বর খান হানাদারদের বন্দী করে শহরে নিয়ে যাবোনা। এরা যে অপরাধ করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি নিজ হাতে দেবো। এরা একটু পূর্বেই কতকগুলো অসহায় নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ক্ষমা আমি কিছুতেই করবোনা। সমীর হীরা তোমরা এদের পায়ে দড়ি বেঁধে গাছের সঙ্গে লটকে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন হাসানের আদেশ পালন করলো ওরা। খান হানাদার বাহিনীর পায়ে দড়ি বেঁধে জঙ্গলের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

বললো হাসান—তোমরা যথেষ্ট পাপ করেছিলো। হত্যা করেছো বাংলার অসংখ্য মানুষ। কত শত শত ঘর বাড়ি তোমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছো তবু আমি তোমাদের ক্ষমা করতাম, বন্দী করে নিয়ে তুলে দিতাম পুলিশের হাতে বিচারে যা হয় তাই হতো কিন্তু তোমরা এই কিছু সময় পূর্বে কতকগুলো মা বোনের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছো। তাদের ইজ্জৎ লুটে নেবার পরও তোমরা তাদের রেহাই দাও নাই—হাসান দাঁতে

দাঁত পিষে কথাগুলো বললো। তারপর—রিভলভার উঁচু করে ধরলো এক এক গুলিতে এক একটি খান সেনার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলো।

সবাইকে শেষ করে হাসান হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ বাংলার সর্বনাশ করে তোমরা রেহাই পাবেনা শয়তানের দল। তোমাদের পরিণতি মস্তকহীন দেহগুলো গাছের ডালে ডালে ঝুলবে। শিয়াল কুকুর তোমাদের দেহের মাংস খেতে পারেনা। তোমাদের দেহের মাংস পঁচে খসে খসে পড়বে নিচে তখন তারা খাবে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ.....

হাসানকে তার দলবল এভাবে হাসতে দেখে অবাক হয়ে যায়। তারা কোনদিন দেখেনি হাসানের এই রুদ্র মূর্তি। দেখেনি তার এমন অদ্ভুত ধরণের হাসি। সবাই ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়, কাজ তাদের শেষ হয়েছে।

হঠাৎ হাসান বলে উঠে—ওকে তো দেখছিনা।

শামীম কিন্তু এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে হাসানের কার্য কলাপ লক্ষ্য করছিলো। দেখছিলো সে হাসানের এক নতুন রূপ। হাসানের সামনে শামীম বলে উঠে—তাইতো রাখাল ছেলেটি কোথায়?

সবার খেয়াল হলো?

এতোক্ষণ খান হানাদারদের সঙ্গে লড়াই নিয়ে ওর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলো সবাই। এবার সকলে মিলে রাখাল ছেলেটির সন্ধানে লেগে গেলো।

হঠাৎ সমীর বলে উঠলো—এইতো এখানে এটী কে পড়ে আছে?

সবাই এগিয়ে গিয়ে দেখলো রাখালের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে শুকনো পাতার মধ্যে। খান হানাদারদের গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে তার কচি বুকের এক পাশে! কখন যে সে পড়ে গিয়েছিলো কেউ জানেনা।

রাখাল বালকটার শিয়রে এসে দাঁড়ালো হাসান। তার সঙ্গীরা অবাক হয়ে দেখলো ক্যাপ্টেন হাসান রুমালে চোখ মুছে। অবাক হলো তারা যে হাসান একটু পূর্বে কঠিন এক মানুষ ছিলো। যে তার রিভলভারের গুলিতে একটু পূর্বে খান সেনা বাহিনীদের লোকগুলোকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করলো সেই হাসান একটা রাখাল ছেলের জন্য অস্ত্র বিসর্জন করছে আশ্চর্য হবার কথা বটে।

বললো হাসান—যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো, সেই অসীম সাহসী আত্মত্যাগী বীর বালক আর ফিরে যেতে পারলোনা আমাদের সঙ্গে। সত্যি বড় দুঃখ বড় বেদনার কথা। আমার বন্ধুগণ তোমরা এই রাখাল

বালকের মৃত দেহ তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে এবং তার দুঃখ ব্যথা দূর করতে চেষ্টা করবে।

হাসানের কথায় তার সঙ্গীরা রাখাল বালকের রক্তাক্ত দেহটা তুলে নিলো কাঁধে।

❑

আজও শামীমা যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন ভাবী কুলসুম ভীষণ মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে এলো। শামীমার চুলগুলো এনে ধরে টেনে নিয়ে চললো—হারাম জাদী ফের তুই বাইরে গিয়েছিলি! আজ তোকে খতম করবো.....

কুলসুমের কথা শেষ হয়না জমকালো একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় তাদের সম্মুখে। হাতে তার উদ্যত সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

কুলসুম সঙ্গে সঙ্গে শামীমার চুল ছেড়ে দেয়। ভয় বিস্ময় নিয়ে তাকায় জমকালো মূর্তিটার দিকে। ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বলে—কে কে তুমি বাবা? কি চাও আমার কাছে?

জমকালো পোশাক পরা লোকটা বলে উঠে—আমি আজরাইল।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো কুলসুম—আজরাইল।

হাঁ তোমার জান নিতে এসেছি। সূতীক্ষ্ণ ধার ছুরিখানা উঁচু করে ধরলো জমকালো মূর্তি কুলসুমের বুকের কাছে।

শামীমাও ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেছে। সে ভয়াতুর চোখে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তিটার দিকে।

কুলসুম হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো—আমাকে মেরোনা তুমি যা চাও তাই পাবে। বলো বাবা কি চাও?

এবার জমকালো মূর্তি বললো—তুমি বাঁচতে চাও।

হাঁ আমি বাঁচতে চাই।

তবে আর কোনদিন এর উপর অত্যাচার করোনা। নিজের সন্তানদের মত একে ভালবাসবে.....

হাঁ—হাঁ তাই বাসবো। আমি শপথ করছি আর কোনদিন ওর উপর অত্যাচার করবো না।

বেশ। আজ তাহলে তোমাকে রেহাই দিলাম। কথা শেষ হতে না হতেই বেরিয়ে যায় জমকালো মূর্তি।

কিং কর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে শামীমা।

কুলসুম একেবারে পাথরের মূর্তি বনে গেছে।

এরপর থেকে কুলসুম সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ বনে গেলো। শামীমাকে সে নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি আদর যত্ন করতে শুরু করলো।

শামীমা ঘুম থেকে উঠতেই তার হাত মুখ ধোয়ার পানি এনে সামনে রাখে কুলসুম। তারপর নাস্তার সময় নাস্তা ভাত খাবার সময় ভাত তরকারী সব না চাইতেই সামনে হাজির। এমন কি গোসলের পানিটাও কুলসুম তুলে দেয় কুয়া থেকে।

শামীমা একেবারে বিব্রত হয়ে পড়ে যে বলে থাক থাক আমিই পানি উঠিয়ে নিছি। কিন্তু কে শোনে তার কথা কুলসুম তার কাজ করে চলেছে। সদা ভয় শামীমের প্রতি একটু অযত্ন হলেই সেই জমকালো আজরাইল এসে তার জান বের করে নেবে। সব সময় কুলসুমের চোখের সামনে ভাসে আজরাইলের হাতের সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা খানা। তাই সে কুকড়ে থাকে অপরাধীর মত।

এখন শামীমা প্রায়ই আসে হলুদ খালি ঘাটিতে। তার কোন অসুবিধা হয় না বা বাধা পায় না।

একদিন হাসান হেসে বলে শামীমা আজকাল তোমাকে সব সময় প্রসন্ন বলে মনে হয়। তোমার ভাবী বুঝি এখন তোমার কোন কাজে বাধা দেয় না?

শামীমা হেসে বললো—সত্যি আশ্চর্য ভাবে পাল্টে গেছে ভাবী।

কারণ?

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কদিন থেকে আপনাকে কথাটা বলবো বলবো করছি কিন্তু বলা হয়নি।

কি এমন ব্যাপার? বললো হাসান।

শামীমা এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই রাতের কাহিনীটা বর্ণনা করে শোনালো।

হাসান দু'চোখ কপালে তুলে বললো—সত্যি আমিও আশ্চর্য না হয়ে পারছিনা। কে সে জমকালো পোশাক পরা লোকটা। নিশ্চয়ই কোন দুষ্কৃতি হবে।

নানা সে দুষ্কৃতি নয়। কোন মহৎ জন—

তবে অমন আত্মগোপন করে যাবে কেনো? সরাসরি গিয়ে তোমার ভাবীকে বলতে পারতো বা শাসন করে দিতে পারতো। যাক সে সব কথা, তোমার সব অসুবিধা দূর হয়েছে তো?

হাঁ। ভাবী আমাকে এখন খুব যত্ন করেন।

আচ্ছা শামীমা তা হলে তোমার এ পুরুষ ড্রেসের আর কোন প্রয়োজন নাই। সরাসরি এখানে হাজির হবে, এখানে সবাই তোমাকে বোনের মর্যাদা দেবে। হাঁ আজ কয়েকটা কথা বলবো তোমাকে।

বলুন হাসান ভাই।

শুধু তুমি নও তোমার মত আর বহু বোন আছে যারা দেশ গড়ার কাছে উৎসাহী। তুমি তাদের নিয়ে আসবে, আমি সবাইকে কাছে বলে দেবো। বাংলার নারী পুরুষ সকলেরই কর্তব্য আছে। শুধু পুরুষ কাজ করবে নারীরা পারবেনা এক হতে পারে না। নারী পুরুষ মিলে গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা।

শামীমা পরদিন বাড়িতে এসে ভাবীর কাছে সব খুলে বললো। ভাবী সব শুনে আনন্দে আত্মহারা হলো, বললো—স্বামী ভুল বুঝেছিলো বলে আমিও ভুল করতে পারিনা। স্বাধীন বাংলার আমিও একজন স্বাধীন মানুষ। আমার কি এতোটুকু কর্তব্য নাই? শামীমা আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিবি।

পরদিন গ্রামের মেয়েদের ডেকে শামীমা সবাইকে দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়ার জন্য অনুরোধ জানালো। যারা তার সঙ্গে যাবার জন্য আগ্রহ দেখালো শামীমা তাদের সঙ্গে নিয়ে গেলো হলুদ খালি ঘাটিতে।

হাসান শামীমা ও তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে হলুদ খালি ঘাটির মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো।

হাসান বললো এই যে বোনটিকে সম্মুখে দেখছো একে চিনতে পারছো তোমরা? নিশ্চয়ই পারছোনা কারণ একে তোমরা দেখোনি কোনদিন তাই না?

মুক্তিযোদ্ধা তরুণরা বললো—না।

কিন্তু আমি যদি বলি তোমরা একে বহুবার দেখেছো। এমনকি এর সঙ্গে এক হয়ে কাজও করেছো তোমরা।

সবাই অবাক হয়ে একবার হাসান ও একবার শামীমার মুখে তাকাতে লাগলো।

হাসান বললো—তোমরা শামীমকে চিনতে?

শামীম নামটা শুনতেই সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—হাঁ তাকে চিনি।

এই সেই শামীম। হাসানের মুখে মৃদু হাসির রেখা একটু থেমে বললো আবার—আমাদের সমাজ মেয়েদের চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। তাই শামীমা পুরুষের বেশে চার দেয়ালের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলো। যোগ দিয়েছিলো সে দেশ গড়ার কাজে। যতটুকু পেরেছে সে অন্তর দিয়ে সাহায্য করেছে। তোমরা জানো মসিপুর সাঁকো মেরামত কালে সেও ছিলো তোমাদের পাশে। শিবপুর বিধ্বস্ত গ্রামে আবার ঘর বাড়ি তৈরি করা কালে শামীম তোমাদের অনেক সাহায্য করেছে। হাতীমারী খান সেনাবাহিনী এবং অবাঙ্গালীদের পাকড়াও কালে সে আমাদের সঙ্গী হবার জন্য যথেষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো কিন্তু আমি তাকে ক্ষান্ত করেছিলাম। এর পরের সংগ্রামে হিজলা জঙ্গলে সে আমাদেরই পাশে ছিলো কাজেই শামীমের সব কিছু তোমরা জানো।

হাঁ আমরা তাকে ভাল ভাবে জানি।

কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জানতে না। শামীম নারী পুরুষ নয়। তোমরা এবার বুঝতেই পারছো পুরুষদের মতই নারীদের কর্তব্য আছে এবং করবার ক্ষমতাও আছে। তাদের বাদ দেওয়া যায়না। আজ শামীমার সঙ্গে যে সব বোনেরা এসেছেন এরা সবাই তোমাদের সঙ্গে মিশে দেশ গড়ার কাজ করতে চান।

মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা বলে উঠে—আমরা খুশি মনে আমার বোনদের সহায়তা গ্রহণ করবো। আমরা তাদের সমান অধিকার দেবো আমাদের পাশে।

এবার হলুদ খালি ঘাটিতে নারী পুরুষ মিলে কাজ চললো। যখন যে গ্রামে প্রয়োজন মনে করলো সেখানেই তারা হাজির হলো। পুরুষদের কাজ পুরুষরা করতো আর মেয়েদের সহায়তায় মেয়েরা এগিয়ে যেতো। যে সব মহিলা বা তরুণী খান সেনাবাহিনী দ্বারা নির্যাতীত তাদের শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা এবং পুনঃর্বাসনের ব্যবস্থা করতো।

হলুদ খালি এবং হলুদ খালির আশে পাশে কয়েকটা গ্রাম এবং বন্দর আদর্শ গ্রাম হয়ে গড়ে উঠলো। এ কয়টি গ্রামের প্রত্যেকটা তরুণ এসে যোগ দিয়েছে ক্যাপটেন হাসানের দলে? শুধু তরুণ দলই নয় বৃদ্ধ যুবক বয়স্ক সবাই এসে হাজির হয় কাজের সময়। অবশ্য নিজেদের জমিতে কাজ শেষ করেই আসে তারা।

হাসান বলেছে—আমার কৃষক ভাইরা, তোমরা নিজেদের জমিতে ফসল ফলাও। নিজেদের বাড়ি ঘর মেরামত কর তার পরদিনে একবার দু'ঘন্টা সময় দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করো।

চাষীগণ হাসানের কথা ফেলতে পারেনি তারা জমিতে চাষ করে বাড়ি-ঘর মেরামত করে যখন অবসর পায় তখন এসে হাজির হয় এক জায়গায়। হাসান এদের উপর কাজের দায়িত্ব তুলে দেয়। অবশ্য নিজেও থাকে তাদের সঙ্গে। গ্রামের যে পথঘাট নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো হাসান এদের নিয়ে আবার নূতন করে পথ ঘাট তৈরি করে। পথের দু'ধারে চারাগাছ লাগিয়ে দেয়। পথিকদের ছায়াদান করবে বলে।

এমনি দেশ-গড়ার অনেক কাজ করে ওরা।

হাসান বলে—আমার বন্ধুগণ তোমরা তোমাদের নিজের দেশকে সুন্দর করে গড়ে নিচ্ছো। তোমাদের সুখ-সুবিধার জন্য এসব করছো কাজেই এসব কাজ তোমাদের নিজের কাজ। তোমরা কারো কাছে এর জন্য পয়সা দাবী করোনা। পয়সা তোমাদের কে দেবে। স্বাধীন বাংলার সরকার তো বাংলার মানুষ। তোমরাই দোষী, তোমরাই বিচারক। বঙ্গবন্ধু বলেছেন তোমরা সোনার বাংলাকে সোনার সোহাকময় ভরে তোল, তোমরাই তার ফল ভোগ করবে।

একদিন হাসান যখন বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন হামিদ এসে চুপি চুপি বললো—হাসান ভাই এক ডাকাত দলের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা মুক্তিযোদ্ধার বেশে হানা দিয়ে ডাকাতি করেছে।

বলোকি হামিদ?

হাঁ হাসান ভাই।

কি করে তোমরা এ সংবাদ পেলে?

একটা বৃদ্ধ প্রবেশ করে তাঁবুর মধ্যে—আমার কাছেই হামিদ সংবাদ পেয়েছে। এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন হাসান সাহেব।

একখানা চিঠি বৃদ্ধ হাসানের হাতে দেয়।

হাসান চিঠিখানা খুলে মেলে ধরে চোখের সামনে। চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে বলে—চিঠিখানা আমার কাছে থাক।

বেশ আপনি রাখুন কিন্তু.....

কোন কিন্তু নয় আপনি বাড়ি ফিরে যান।

বাড়ি ফিরে যাবো।

হাঁ।

আজ রাতে তারা যখন আমার বাড়িতে হানা দিয়ে বিশ হাজার টাকা চেয়ে বসবে তখন.....

সে চিন্তা আপনাকে করতে হবেনা। আপনি যান এবং নিশ্চিন্তে ঘুমান গে।

এ আপনি কি বলছেন? মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের আপনি চেনেন না।

হেসে বললো হাসান—কে বললো এরা মুক্তি বাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা ছেলে?

ঐ যে চিঠিতে লেখা আছে' আমরা একদল মুক্তিযোদ্ধা আজ রাত দু'টোয় আপনার বাড়িতে যাবো, বিশ হাজার টাকা মজবুত রাখবেন। পুলিশে জানালে বিপদ আছে এমন কি মৃত্যু.....

অট্টহাসি হেসে উঠলো হাসান—মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা ডাকাত ও একথা আপনি ভাবতে পারেন। বাংলার দামাল ছেলে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বাংলা জননীকে শত্রুমুক্ত করেছে। যারা প্রাণ দিতে এতটুকু ভয় পায়নি। যারা অকাতরে হাসি মুখে রক্ত দিয়েছে তারা ডাকাত। এ কথা ভাবা পাপ। কারণ মুক্তিযোদ্ধা বীরগণ আমাদের বাংলার গৌরব। তারা বাংলার অমূল্য সম্পদ কৃর্তী সন্তান। নানা আমি কোনদিন বিশ্বাস করিনা মুক্তিযোদ্ধারা এমন অসৎ কাজ করতে পারে! আপনি যান সত্যিই যদি তারা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে মুক্তি যোদ্ধাগণ হয় তবে তারা কোন সময় অসৎ কাজ করতে যাবে না। তাদের বিবেক আছে।

বৃদ্ধ মাথা নত করে বেরিয়ে গেলো।

হামিদ বললো—লোকটাকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে হাসান ভাই।

তাতো দেখতেই পেলাম।

হামিদ বললো—শুধু আজ নয় প্রায়ই এখানে সেখানে এই রকম চুরি ডাকাতি লুটতরাজ চলছে। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অনুযায়ী তারা অস্ত্র জমা না দিয়ে সেই সব অস্ত্র নিয়ে এ সব করছে।

হাসান বললো—হামিদ মুক্তি বাহিনী যুবকরা কোনদিন বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করতে পারে না। তাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষেছে যারা তারা কোনদিন অসৎ হতে পারে না। যারা এখন চুরি ডাকাতি লুটতরাজ করছে তারাও বাংলার ছেলে কিন্তু তারা একটা মোহগ্রস্তের মত

এখন দিশে হারা হয়ে পড়েছে। মনে করেছে অস্ত্র যখন হাতে আছে তখন যা খুশি তাই করা যায় তাই এ চুরি ডাকাতি চলেছে।

আমি ভাবছি কি করে এ সব বন্ধ করা যায়?

এদের আঘাত হেনে কাবু করা যাবে না, এদের কানে দিতে হবে মূল্য মন্ত্র। যে মন্ত্র দ্বারা বাংলার মানুষ একদিন পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শত্রু সেনাদের উপর। বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর মধুর বাণীই এদের সৎ পথে টেনে আনবে আর রক্ত ক্ষয় করে বাংলার শ্যামল মাটি সিক্ত করা উচিৎ নয়। হামিদ এই সব চোর ডাকাত যাদেরে বলছে: তারা আমাদেরই ভাই তবে কেনো তারা আমাদের বুকে অস্ত্র চালাবে। তবে একটি কথা স্মরণ রেখো শোষকদের ক্ষমা করবোনা কেউ। সে যে রকমেরই শোষক হোকনা কেনো। চাকুরীজীবী বল ব্যবসায়ী বলো কিংবা বিচারক বা বিচারপতি বলো। বাংলার মানুষের হাতে রেহাই পাবেনা যদি তারা যেনে শুনে অন্যায় করে।

হাসানের প্রত্যেকটা কথা হামিদ মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলো।

হাসান বলে চলেছে—লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে এ বাংলা স্বাধীন হয়েছে। বাংলার প্রতিটি মানুষ চায় শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। কাজেই প্রত্যেকটা মানুষের খেয়াল রাখা দরকার তারা যেন কোন সময় অসৎ মন নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়ে। হাঁ অনেক কিছু বলে ফেললাম। হামিদ যাও তোমার কাজে যাও।

হামিদ তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

পরক্ষণেই তাঁবুতে প্রবেশ করে শামীমা। এতক্ষণ সে আড়ালে থেকে হাসানের সব কথা শুনেছিলো। কথাগুলো যেন তার অন্তর স্পর্শ করে যাচ্ছিলো হাসান যেন একটা অদ্ভুত মানুষ। শামীমা তাঁবুতে প্রবেশ করে স্থির নয়নে তাকায় হাসানের দিকে।

হাসান হেসে বলে—কি দেখছো শামীমা?

হাসান ভাই আপনার কথা গুলো সত্যই সুন্দর। যত শুনি আরও শুনতে ইচ্ছা করে।

তাই নাকি?

হাঁ! সত্যি অপূর্ব।

শামীমা।

বলুন হাসান ভাই?

মানুষ বেঁচে থাকে কিসের মধ্যে, তার কাজের মধ্যে। কাজেই তোমরা আজ যাও। কাজ আমি ভাল বাসি.....

একটু থেমে বললো—বিশাল বিশ্বে অসংখ্য
ভীড়ের মাঝে কে কার মনে রয়
শুধু বেঁচে থাকে তার কাজ
অনন্ত কালের স্বাক্ষর হয়ে
নাহি তার কোনো ক্ষয়।

শামীমা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হাসানের মুখের দিকে ।

হাসান পায়চারী করে চলে। গভীরভাবে কি যেন ভাবে সে। শামীমা বলে—হাসান ভাই একটা কথা বলবো?

হাসান দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়—বলো?

না থাক আজ নয়...বেরিয়ে যায় শামীমা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হাসান ওর চলে যাওয়া পথের দিকে। একটু হাসির রেখা ফুটে উঠে হাসানের ঠোঁটের ফাঁকে তারপর পকেট থেকে সেই চিঠিখানা বের করে ধরে চোখের সামনে।

❑

একদল মুক্তিযোদ্ধা বেশী ডাকাত প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। তাদের অধিনায়ক রুশদী বললো—অর্থ চাই আবারও অর্থ। অর্থের বিনিময়ে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তার দলবল সবাই বলে উঠলো হাঁ আমরা অর্থের বিনিময়ে প্রাণ দিবো। সকলে দক্ষিণ হস্তে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জমকালো পোশাক পরা অবস্থায় একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো। তার দু'হাতে দুটি রিভলভার। মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। আচমকা এই জমকালো মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে সবাই হক চকিয়ে গেলো।

জমকালো মূর্তি বললো—সবাই অস্ত্র ফেলে দাও। নইলে গুলি ছোড়বো।

রুশদীর দিকে তাকালো তার দলবল।

রুশদীর দুচোখ রক্তবর্ণ ধারন করেছে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তির হাতের আগ্নেয়অস্ত্র দুটির দিকে।

জমকালো মূর্তি পুনরায় কঠিন কণ্ঠে বললো, একচুল নড়বেনা। নড়লেই মৃত্যু—ফেলে দাও তোমার হাতের অস্ত্র।

জমকালো মূর্তির কণ্ঠে এমন একটা বলিষ্ঠতা ছিলো যার জন্য রুশদী তার নিজের হাতের রাইফেল খানা ফেলে দিতে বাধ্য হলো।

সঙ্গে সঙ্গে রুশদীর দলবল নিজ নিজ অস্ত্র ফেলে দিলো রুশদীর অস্ত্রের পাশে।

জমকালো মূর্তি এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো, যেখানে দাঁড়ালে সমস্ত ঘরখানাকে আয়ত্বে রাখা সম্ভব হবে। জমকালো মূর্তির হাতের উদ্যত রিভলভার দুটির দিকে তাকালে হৃদয় কেঁপে উঠে। রুশদীও তার সাথীদের অবস্থাও সেই একইরকম হয়ে পড়ে। কে এই জমকালো মূর্তি, হঠাৎ কোথা থেকে বা তার আবির্ভাব।

জমকালো মূর্তি রিভলভার ঠিক রেখে, পা দিয়ে রুশদী ও তার সাথীদের ফেলে দেওয়া রাইফেলগুলো এক একটা নিজের পিছনে সরিয়ে ফেললো।

রুশদী এবং তার সহকারীরা ভীত হয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহই নাই। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে।

জমকালো মূর্তি বললো—তোমরা অর্থের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবে। এই তোমাদের শপথ?

রুশদী বললো—হাঁ। কিন্তু বলো কে তুমি?

আমার পরিচয় পরে জানতে পারবে। তোমরা অর্থ চাও, বেশ ভাল কথা, কত অর্থ হলে তোমরা খুশি হও? এক লক্ষ, দু'লক্ষ, তিন লক্ষ....বলো কত চাও?

রুশদীর দু'চোখ গোলাকার হয়, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে সে, ভাবে লোকটা বলে কি।

জমকালো মূর্তি বলে উঠে—জবাব দিচ্ছোনা কেনো, বলো কত টাকা তোমরা চাও?

তবু নীরব রুশদী।

জমকালো মূর্তি বললো—যত টাকা চাও আমি দেবো তোমাদের। শুধু টাকা নয় সোনা দানা সব কিছু পাবে। তার বিনিময়ে তোমাদের জীবন চাইনা। চাই তোমাদের বাবা মা ভাই বোনদের রক্ত।

চমকে উঠে তাকালো সবাই জমকালো মূর্তির দিকে। রুশদীর চোখে মুখে বিস্ময়।

জমকালো মূর্তির হাতের রিভলভার কোন সময়ের জন্য এতোটুকু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। রিভলভার ঠিক রেখে কথা বলছিলো জমকালো মূর্তি। এবার বললো—পারবে তোমরা, তোমাদের বাবা, মা, ভাই, বোনদের রক্ত দিতে? যদি পারো তবে বলো কত টাকা চাও? চুপ করে থেকোনা।

এবার রুশদী বললো—না; বাবা, মা, ভাই, বোনদের রক্তের বিনিময়ে অর্থ আমরা চাইনা।

চাওনা লক্ষ লক্ষ টাকা, চাওনা সোনা দানা।

না না। সবাই বললো একসঙ্গে।

জানি তোমরা বাঙ্গালী। বাংলার মাটিতে তোমাদের জন্ম। তোমরা কোনদিন পারোনা অর্থের বিনিময়ে বাবা, মা, ভাই, বোনদের রক্ত দিতে। তোমাদের কাছে বুক ভরা মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসা। পারবেনা তোমরা নিজের আপন জনদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে। জমকালো মূর্তি মুখের আবরণ খুলে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে রুশদী ও তার সঙ্গীরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—ক্যাপ্টেন হাসান আপনি.....

ক্যাপ্টেন হাসান নই, তোমাদের হাসান ভাই। রিভলভার দু'টো বেল্টের কভারে রেখে সরে আসে, রুশদীর পিঠ চাপড়ে বলে—তোমাদের কথা শুনে সত্যি আমি বড় খুশি হয়েছি। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়েও তোমরা চাওনা আপন জনদের বিসর্জন দিতে। ভাই রুশদী তোমরা বাংলার ছেলে, বাংলার সব মানুষ তোমাদের আপন জন। বাংলার মানুষের সুখ সাচ্ছন্দ তোমাদের নিজেদের সুখ সাচ্ছন্দ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলা জননী আজ সর্বহারা! সে তাকিয়ে আছে তার সন্তানদের মুখের দিকে, তোমরা তারই সন্তান। এখন বাংলা জননীকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলবে তোমরাই। তোমাদের দায়িত্ব অনেক,—দেশ গড়ার পালা এখন তোমাদের। দেশকে সবদিকে সুন্দর সুষ্ঠু করে গড়ে নাও দেখবে তোমাদের বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের মুখে হাসি ফুটেছে! অর্থ তখন তোমাদের পায়ের নিচে গড়াগড়ি যাবে। শপথ গ্রহণ করো—এ অস্ত্র আর তোমরা দুঃস্কর্মের জন্য হাতে তুলে নেবেনা। যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র আবার আপনা আপনি আসবে তোমাদের হাতে। তোমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দাও। দেশ গড়ার কাজে

আত্ম নিয়োগ করো। বহুত্যাগ তোমরা দিয়েছো, পারবেনা এবার দেশ গড়ার কাজে আত্মত্যাগ করতে?

রুশদী বলে উঠে—পারবে।

তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সবাই বলে উঠে—পারবো।

হাসানের মুখে হাসী ফুটে উঠে।

এরপর থেকে রুশদীর দলও এসে যোগ দেয় ক্যাপ্টেন হাসানের দলে। কৃষক শ্রমিক মজুর, ছাত্র জনতা, কেউ বাদ দেয়না, সকলে দেশ গড়ায় নেমে পড়ে।

যেখানেই শোনে চুরি-ডাকাতী চলেছে, সেখানেই গিয়ে হাসান জনতার মধ্যে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে। বাংলার মানুষ সর্বস্ব দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছে, কাজেই বাংলার শান্তি রক্ষার ভার বাংলার মানুষেরই উপর রয়েছে। তারা যদি বাংলার স্বাধীনতার মর্যাদা নষ্ট করতে চায়, তাতে ক্ষতি বিদেশের মানুষের হবে না, হবে বাংলার মানুষের।

আরও বহু যুবক দল বিভিন্ন এলাকায় দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারী-পুরুষ সবাই মিলে চলে দেশ গড়ার সংগাম।

রিয়াজ আলীও তার দল-বলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার পর দালাল বাহিনীর লোক যারা এখনও মন-প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারছিলো না তারা নিজেদের মনোভাব পাল্টে নেয়। কারণ জানে তাদের অবস্থাও এমনি হতে পারে।

যে সব রাজাকার এবং বদর বাহিনীর লোক বাংলার মানুষের মধ্যে মিশে আছে, তারা যেন আর কোন রকম বিশ্বাস ঘাতকতা না করে সেজন্য তাদের কাছে অনুরোধ জানায় হাসান।

কিন্তু যারা দুষ্ট লোক তারা কোনদিন সৎবাক্য গ্রহণ করে না। যেমন সাপকে যতই দুধ-কলা দেন না কেনো, সাপ সুযোগ পেলেই ছোবল মারবেই মারবে।

একদিন একটি বদর বাহিনীর লোক, সাধু সেজে ভদ্র লোকের মত, এসে হাজীর হলো ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে। সে এসে জানালো, দেশ গড়ার কাজে সে যোগ দিতে চায়।

লোকটাকে অবশ্য সঙ্গে এনেছিলো ফারুক।

ক্যাপ্টেন হাসান লোকটার পা থেকে মাথা অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—আপনার মনোভাব জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম, বেশ আপনি যোগ দিতে পারেন আমার দলে। আপনার নামটা কি সাহেব?

নাম.....আমার নাম.....আলী হায়দার।

হুঁ ভাল। যাও ফারুক একে তোমাদের দলে যোগ করে নাও।

ফারুক সহ চলে গেলো আলী হায়দার।

এমন সময় তাঁবুতে প্রবেশ করলো শামীমা।

হাসান আসন ত্যাগ করে উঠতে যাচ্ছিলো পুনরায় বসে পড়ে বললো—শামীমা হঠাৎ কি মনে করে?

কেনো আমার আসতে নাই বুঝি?

না না তা বলছিনা। বসো।

শামীমা বসে পড়ে।

হাসান বলে—শামীমা সেদিন কি যেন বলবে বলেছিলে?

তোমার মনে আছে এখনও।

থাকবে না, এতো বড় একটা ব্যাপার। বলো, সেদিন কি বলবে বলেছিলে?

না থাক।

উঁ-হুঁ বলতে হবে আজ তোমাকে।

মাথা নিচু করে শামীমা।

হাসান ওর মুখ খানা তোলে ধরে—তোমার কথাটা আমি বলি কেমন?

এবার চোখ তোলে শামীমা।

বলো, বলবো তোমার মনের কথাটা?

ছোট্ট করে বলে শামীমা—বলুন?

সত্যি বলবো?

হ্যাঁ।

তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার বড্ড ভালো লাগে.....বলো তোমার মনের কথা বলেছি কিনা?

শামীমার গণ্ড রক্তাভ হয়ে উঠে। চোখ দুটো নিচু করে রাখে সে।

হাসান হাসে, শামীমার মনোভাব সে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলো। শামীমা কারণে অকারণে প্রায়ই তার তাঁবুতে আসতো। ভাবী কোন জিনিষ তৈরি করলে সে লুকিয়ে আনতো হাসানের জন্য। নিজের হাতে শামীমা কতদিন হাসানের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে। সরল পল্লী বালিকার ইচ্ছাকে সে বাধা দেয়নি কোনদিন। বরং এতে হাসান আনন্দ লাভ করেছে। হাসান বলে আবার বলো চুপ করে রইলে কেন?

হাঁ।

তোমাকেও আমার খুব ভাল লাগে শামীমা.....

হাসানের কথা শেষ হয়না দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে যায় শামীমা। দু'চোখে তার খুশির উচ্ছাস।

পথে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—জানিস আজ আমার কি আনন্দ।

বান্ধবী অবাক হয়ে বলে—কি বলছিস তুই?

সত্যি। কথাটা খোলাসা না বলেই সোজা সে বাড়ির পথে ছুটে চলে।

বান্ধবী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

হাসান তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পায় তার তাঁবুর পাশ থেকে সরে যায় আলী হায়দার।

হাসান অধর দংশন করে।

রাতে বৈঠক বসে হাসানের।

সেখানে সকলের সঙ্গে আলী হায়দারও ছিলো।

হাসান সবাইকে লক্ষ্য করে বললো—আজ রাতে আমরা হাওলা চরে যাবো। সেখানে কয়েকজন লোক আমাদের জন্য প্রচুর অর্থ এবং সোনা নিয়ে অপেক্ষা করবে। এরা একদল মুক্তিযোদ্ধা বেশী ডাকাত দল। ওরা আত্মসমর্পণ করবে বলে জানিয়েছে।

হীরা আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললো—এ সংবাদ অতি খুশির সংবাদ। কিন্তু যদি কোন চক্রান্ত থাকে এর পেছনে।

সেও তো আনন্দের কথা হীরা। চক্রান্তকারী ডাকাত দলকে সায়েস্তা করার সুযোগ পাবো। কিন্তু আমার মনে হয় এরা কোন চক্রান্তকারী নয়।

গভীর রাতে হাসান দলবল নিয়ে হাওলা চরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। কিন্তু আলী হায়দার কই। সে কখন তাদের দল থেকে সরে পড়েছে।

হীরা আশঙ্কা প্রকাশ করলো।

হাসলো হাসান।

হাসানের হাসির মানে কেউ তখন বুঝতে পারলো না।

হাওলা চরে পৌঁছবার পূর্বে হাসান সবাইকে বললো—তোমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকবে এবং তোমরা কেউ হাওলা চরে যাবেনা। আমি একা যাবো, যখন পর পর তিনটা গুলি ছুড়বো তখন তোমরা নৌকায় চেপে ওপারে যাবে।

হাসান এবার অন্ধকারে এগুলো।

দূরে হাওলা চর।

হাওলা নদীতে অনেকগুলো নৌকা বাঁধা ছিলো, হাসান সেই নৌকার একখানাতে চেপে বসলো। নিজেই বৈঠা চালিয়ে অল্পক্ষণে ওপারে পৌঁছে গেলো।

তীরে নেমে দাঁড়াতেই সা করে একটা গুলি চলে গেলো তার কানের পাশ কেটে।

হাসান সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরে বালুর মধ্যে উবু হয়ে শুয়ে পড়লো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে কঠিন বলিষ্ঠতার ছাপ।

বুকে ভর করে দ্রুত এগোয় হাসান। গুলিটা আসায় তার পক্ষে ভাল হয়েছে কারণ সে বুঝতে পারলো, কোন দিকে তাকে এগুতে হবে।

জমাট অন্ধকার।

হীম শীতল বাতাস বইছে।

হাসান আজ দুপুরে তাঁবুতে যখন বিশ্রাম করছিলো তখন একটা ছোট্ট ছেলে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলেছিলো—একটা লোক এটা দিয়েছে।

হাসান চিঠিখানা খুলে পড়ে দেখে, তাতে লিখা আছে—

ক্যাপ্টেন হাসান,

হাওলা চরে আসবেন।
আমরা একদল ডাকাত আপনার
কাছে আত্মসমর্পণ করবো। আমরা
আমাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত।

সর্দার ডাকাত।

হাসান যখন হাওলা চরের মাঝামাঝি পৌঁছে গেলো তখন সে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একজন লোক একটা উঁচু টিলার উপরে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসান একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ করে লোকটা পড়ে গেলো।

মাত্র এক মিনিট পর পরই প্রায় দশ-বারো জন লোক সেই জায়গায় ছায়ার মত বেরিয়ে এলো। এরা এতোক্ষণ চরের মধ্যে ঝোপ ঝাড়ের পাশে লুকিয়ে ছিলো।

হাসান যে জায়গায় আত্মগোপন করেছিলো সেদিকটা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক, কাজেই ডাকাত দল তার উপস্থিতি বুঝতে পারলো না।

হাসান একটির পর একটি ঘায়েল করে চললো।

শুধু আর্তনাদ ভেসে আসছে হাওলা চর থেকে নদীর বুকে। নদীর পানিতে কেঁপে কেঁপে ভাসছে শব্দটা।

হাসানের লক্ষ্য নিপুন, একটি গুলিও তার বিফল হয়না। ডাকাত দল ভেবেছিলো, হাসানের দলকে ভুলিয়ে এনে তাদের হত্যা করবে, কিন্তু হাসানের হাতে বেশ কয়েকজন নিহত হবার পর, ওরা বুঝতে পারলো পরাজয় তাদের আসন্ন। তখন সবাই পালাতে শুরু করলো।

নৌকায় চেপে বসতেই হাসান ফাঁকা তিনটা গুলির আওয়াজ করলো।

অমনি হাসানের দলবল নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে যখন দেখতে পেলো, একদল লোক রাতের অন্ধকারে নৌকা বেয়ে পালাচ্ছে, তখন তারা গুলি ছুড়তে শুরু করলো।

এদিকে হাসানও গুলি ছুড়ছে। হাসানের গুলিতে আরও কয়েকজন নিহত হলো।

ওরাই পাল্টা গুলি ছুড়ছে কিন্তু পলাতক ডাকাত দলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে সব।

প্রায় সমস্ত রাত ধরে চলে হাসানের দল আর হাওলা চরের ডাকাত দলের গুলি বিনিময়। ভোর রাতে মাত্র তিনজন জীবন্ত ডাকাত ধরা পড়ে যায় ক্যাপ্টেন হাসানের হাতে।

ভোরের আলোতে ওরা স্পষ্ট দেখলো এই ডাকাত দলের অধিনায়ক সর্দার ডাকাত হলো আলী হায়দার নিজে।

আলী হায়দার যেদিন প্রথম গিয়ে হাসানের দলে যোগ দেয়, সেদিনই হাসান তাকে বুঝতে পারে এ লোকটা সাধারণ লোক নয় এবং সে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যে তাদের দলে প্রবেশ করেছে এটাও সত্য। হাসান এরকম একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলো।

আলী হায়দার ও তার জীবন্ত সঙ্গী দুইজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো হলুদখালী ঘাটিতে। তারপর প্রকাশ্যে তাদের মাথা নেড়ে করে, মুখে চুন কালি মাখিয়ে, শহরে হাজতে পাঠিয়ে দিলো।

একটা দুধর্ষ ডাকাতদল ধ্বংস হলো।

এবার হাসান মনোযোগ দিয়ে অসৎ ব্যবসায়ী যার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত রেখে বাজারে অগ্নিমূল্য সৃষ্টি করেছে।

তার দলের তরুণ ছেলেদের ছাড়িয়ে দিলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়। কার গোপন গুদামে কত জিনিষ মওজুত আছে জেনে নিয়ে তাকে জানাবে।

এবার শুরু হলো মজুতকারী দুষ্কৃতিকারীদের সায়েস্তা করার পালা। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করে যে সব ব্যবসায়ী প্রচুর লাভের জন্য জিনিস গোপনে লুকিয়ে রেখেছে তাদের জিনিস গোপন স্থান থেকে টেনে বের করে আনতে হবে।

হাসান নিজেও এক কাজে ঝাপিয়ে পড়লো।

হাসান কিন্তু ইতিপূর্বেই তার কয়েকজন সঙ্গীকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে বাংলাদেশের কাজ শেষ করেই চলে আসবে পশ্চিম পাকিস্তানে। শত শত বাঙ্গালী নারী পুরুষ আজ সেখানে আছে। তারা কি অবস্থায় আছেন বা আছে সঠিক কেউ জানে না। তবে তাদের জীবন যে এক ভয়ানক অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাসান বাংলাদেশের কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী বাঙ্গালীদের কথা।

❑

ঢাকার কোন এক গলির মধ্যে প্রবেশ করলো একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভ আসনের পাশে বসে এক ব্যক্তি, তার মাথায় টুপি, আচকান আর পা-জামা পরা।

গাড়ির চালকের মাথায় একটা ক্যাপ। ক্যাপ দিয়ে তার মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা।

টুপি পরা লোকটা ড্রাইভারকে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি রাখতে বলে।

বাড়িটা তেমন অট্টালিকা নয়, ভাঙ্গাচুরা একটি কারখানা ধরণের মনে হয়। ড্রাইভার গাড়ি রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে টুপি পরা লোকটা নেমে পড়লো।

ড্রাইভার তার ছোট্ট এটাচী ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললো—চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি স্যার।

টুপি পরা লোকটা তার বিপুল দেহ নিয়ে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হওয়ায় সে ড্রাইভারকে বলে—এগিয়ে এসো।

লোকটা দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে দেয় একটা ছোকরা বলে—সেলাম স্যার।

লোকটা একটু মাথা দোলায় তারপর ভিতরে প্রবেশ করে। পিছনে পিছনে ড্রাইভারও প্রবেশ করে।

ছোকরা মনে করে সাহেবের ড্রাইভার কাজেই তাকে বারণ করে না। সোজা ওরা চলে যায় ভিতরে।

ছোকরা দরজা বন্ধ করে দেয়।

ভিতরে প্রবেশ করতেই কয়েকজন কর্মচারী ধরণের লোক, টুপি পরা বিপুল দেহী লোকটাকে ওরা ছালাম জানালো তারপর এগিয়ে চললো তার পিছনে সবাই।

বাইরে থেকে বাড়িটা ভাঙ্গাচুরা কোন কারখানা মনে হলেও ভিতরটা অদ্ভুত। ছোট ছোট গুদাম ঘরের মত বহু ঘর। লোকটা প্রত্যেকটা ঘরে প্রবেশ করে মাল পরীক্ষা করে দেখলো। কোন গুদামে হাজার হাজার মণ চাউলের বস্তা সাজানো রয়েছে, কোন গুদামে বস্তা বস্তা চিনি। কোনটায় নারিকেল তৈল টিন-টিন ভর্তি।

বাজারে মাল নেই অথচ গুদামে মাল ধরছে না। গোপনে কিছু কিছু মাল এখানে সেখানে চালান যাচ্ছে বটে কিন্তু অগ্নি মূল্যে।

মালিক গুদামগুলো পরীক্ষা করে অফিস রুমে এসে বসলো। কয়েক জায়গায় ফোন করলো, আলাপ হলো মাল বিক্রি কিনি নিয়ে। বাংলাদেশ সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে এমনি আরো কত ব্যবসায়ী যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে চরম এক অবস্থার সম্মুখে ফেলেছে।

রাত বেড়ে গেলো হিসাব নিকাশ দেখতে।

একে একে চলে গেলো কর্মচারীগণ।

কয়েকজন পাহারাদার ও মালিক রইলো তখনও সেখানে।

এবার মালিক উঠে দাঁড়ালো—

ওপাশে একটা টুলের উপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে ড্রাইভার।

মালিক বললো—ড্রাইভার এবার চলো।

হাইতুলে উঠে দাঁড়ালো ড্রাইভার।

পরদিন দেখাগেলো বিপুল দেহ বিশিষ্ট মালিক তার চালের গুদামের মেঝেতে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে আছে। সমস্ত দেহের উপর সারি বদ্ধ ভাবে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েক বস্তা চাল। জিভটা বেরিয়ে এসেছে মুখের ভিতর থেকে। চোখ দুটো ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পায়খানা দ্বার দিয়ে পেটের নাড়ী ভুরি বেরিয়ে পড়েছে।

সকলের চক্ষুস্থির। এ যেন এক ভুতুড়ে ব্যাপার।

সমস্ত শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে ভীষণ ভাবে কানা-ঘুষা চললো।

দু'দিন পর দেখা গেলো আরও একটি চোরা কারবারী তার শয়ন কক্ষে টাকার সিন্দুকের মধ্যে মাথা গুঁজে মরে আছে। মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে টাকা গুলোর উপরে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ঠিক দু'দিন পর আর একজন কারবারী লোক তার তৈলের গুদামে একটা ড্রামের মধ্যে মাথাটা নিচে পা মুখখানা আকাশের দিকে তুলে জান্নাত বাসী হয়েছেন।

সমস্ত শহরে একটা আতঙ্ক ভাব ছড়িয়ে পড়লো। ব্যবসায়ী মহলের মুখ চুন। যে সব ব্যবসায়ী ভৰলীলা সাঙ্গ করলেন তাদের প্রত্যেকটা লোক মুনাফাকারী জাদরেল ব্যবসায়ী।

বড়দের অবস্থা দেখে ছোট খাটো ব্যবসায়ীরা কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেলো। সকলের মুখেই কালি পড়ে গেছে।

এবার বাজারে জিনিস বেরুতে শুরু করলো। ব্যবসায়ীরা আর মাল গুদামজাত করে রাখার সাহসী হলোনা। না জানি কখন তার ভাগ্যে কি ঘটে।

ব্যাপারটা প্রথমে শহরে শুরু হলেও গ্রামে বন্দরেও শুরু হলো। পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, এ সব যেন নিত্য নতুন ঘটনা।

হলুদ খালি ক্যাম্পে সেদিন এ ব্যাপার নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে।

অদূরে একটা খাটিয়ায় অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় একখানা বইএর পাতা উল্‌টাছিলো ক্যাপ্টেন হাসান। হীরা বললো—হাসান ভাই দেখেছো আজ

রাতে ময়না পুর বন্দরের কাছে এক ব্যবসায়ী তার মাল গুদামে চিনির বস্তার মধ্যে মুখ গুঁড়ে মরে আছে। আশ্চর্য পরপর এমনি প্রায়ই এখানে সেখানে ঘটছে। কে-বা কারা ওমন কাজ করছে?

খলিল বলে উঠলো—না জানি কোন মহৎ ব্যক্তির এ কাজ নিশ্চয়ই কোন দল ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা ব্রত গ্রহণ করেছে।

হাসান এতোক্ষণ শুনছিলো ওদের কথাগুলো। এবার হীরার প্রশ্নের উত্তর দেয়—হুঁ শুনলাম।

হীরা বললো—আশ্চর্য বটে।

হাসান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—আশ্চর্য মোটেই নয়, কারণ যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনি ফল পাবে। বঙ্গবন্ধু বললেন এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে জিনিসের দাম কমিয়ে ফেলতে হবে। তাঁর কথা শুনে ব্যবসায়ী মহলের পিলে চমকে গেলো। মুখে কালি পড়লো কিন্তু কেউ কি মাল ছাড়লো? খোলা বাজারে যা ছিলো তাও চোরা গুদামে উঠে পড়লো। এই সব ব্যবসায়ীরা মুখের কথায় সায়েস্তা হবেনা তাই হয়তো কেউ তাদের সায়েস্তা স গ্রামে মনোযোগী হয়েছে।

ঠিক বলেছেন হাসান ভাই, মুনাফাকারী ব্যবসায়ীরা যদি ভাল মানুষের মত ভালয় ভালয় জিনিস গুদাম থেকে বের না করে, তাহলে এই ভাবেই তাদের সায়েস্তা করতে হবে।

খলিল বলে উঠলো—অনেক ব্যবসায়ী আছে তারা এমন গোপন মাল লুকিয়ে রেখেছে যা খুঁজে বের করা মুস্কিল।

হাসলো হাসান—জনগণের চোখকে ফাঁকি দেওয়া আর সম্ভব নয়। তারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছে, এ স্বাধীনতাকে তারা অন্যায় অবিচারে বিনষ্ট করতে দেবেনা। কাজেই যেখানে যে ব্যক্তি যাই অন্যায় করুক না কেনো, তাকে সমুচিত শাস্তি পেতেই হবে। শুধু ব্যবসায়ী মহলই নয়, চাকুরী জীবী, যারা নিত্য নতুন পয়সার লোভে ঘুষ খাবে, তাদের অবস্থাও কাহিল হবে। পয়সা দিয়ে জনগণ কাজ হাসিল করিয়ে নেবে না, যদি কোন ব্যক্তি কাজ করে দেবে বলে পয়সা চায় তার টুটি ধরে টেনে আনবে পথের ধুলায়। তারপর বিচার করবে জনগণ। হাঁ আরও একটা কথা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাহায্যার্থে বিদেশ থেকে বহু রিলিফ দ্রব্য আসছে। বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষদের বাঁচানোর জন্য বিদেশের এই সাহায্যদান।

বলে উঠে মাসুদ—হাসান ভাই, সেদিন সংবাদপত্রে দেখলাম কোথাও কোথাও সাহায্য দ্রব্যাদি রিলিফ কর্মকর্তাগণ আত্মসাৎ করে চলেছে।

সত্যি এ কথা চিন্তা করতেও ঘৃণা হয়। বাংলার মানুষের জন্য বিদেশীরা দয়া পরবশ হয়ে এ সব রিলিফ সাহায্য পাঠাচ্ছে। বাংলার মানুষ যেনো না খেয়ে মরে না। আর দেখো, সেই সব সাহায্য দ্রব্য রিলিফ কর্মকর্তারা কিভাবে হজম করে নিচ্ছে। কথাটা কিন্তু বাংলাদেশেই চাপা থাকবেনা। বাইরের দেশ গুলিতে ও ছড়িয়ে পড়বে। ভেবে দেখো এটা কত বড় লজ্জার কথা। হ্যাঁ এই ধরনের রিলিফ আত্মসাৎকারী ব্যক্তিদের কিছুতেই ক্ষমা করা উচিৎ হবেনা। এটা শুধু অপরাধ নয়, চরম দোষণীয় ব্যাপার। বাংলার লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস এ ভাবে হজম করবে, এক দল মানুষ নামি পশু.....হাসান কথার ফাঁকে দাঁতে দাঁত পিষলো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো—রিলিফ দ্রব্য চুরি, এর মত জঘন্যতম ঘৃণার কাজ আর কিছু নেই। এরা মনে করে আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই তো জিনিস গুলো সরিয়ে ফেলছি, বাইরের লোক টের পাবে না। কিন্তু তারা জানেনা পাপ কোন দিন চাপা থাকে না।

হাসানের কথাগুলো প্রতিটি যুবকের ধমনির রক্তে আলোড়ন তুললো। সত্যি এই সব লোকদের কিছুতেই ক্ষমা করা চলবেনা। প্রতিটি জনগণকে সজাগ সর্তক হতে হবে। রিলিফ দ্রব্য প্রচুর আসছে, বাংলার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অসহায় মানুষদের জন্য। সে গুলি ঠিক মত সকলে পাচ্ছে কিনা। বিশেষ করে জনগণকে এ ব্যাপারে বেশি খেয়ালী হতে হবে।

হাসান বললো—বঙ্গবন্ধু বলেছেন শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ে তোল। বাংলার সব মানুষকে হুঁশিয়ার হতে হবে, নিজেরা অন্যায় করবেনা, অন্যায়কেও ক্ষমা করবেনা তারা। তাহলেই সোনার বাংলা সুখ শান্তিতে ভরে উঠবে। একটু থেমে বললো হাসান—আজ একটা কথা তোমাদের বলবো। সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকালো হাসানের মুখের দিকে।

হাসান বললো—তোমরা সবাই আছে এখানে?

হীরা সকলের দিকে তাকিয়ে বললো—শামীমা ছাড়া আমরা সবাই আছি হাসান ভাই।

হুঁ। একটু শব্দ উচ্চারণ করে বললো হাসান—বাংলাদেশের মানুষ তোমরা। তোমাদের কর্তব্য বাংলার স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে বজায় রাখা। বাংলার মানুষ প্রত্যেকেরই সজাগ থাকতে হবে, দেশ কি করে আদর্শ

সার্বভৌম দেশ হিসাবে গড়ে উঠে, সেই চেষ্টা করতে হবে। না হলে বঙ্গবন্ধুর মহৎ মহান আদর্শ নেতা হয়েও তিনি একা গোটা বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারবেন না। বাংলার প্রতিটি মানুষকে হতে হবে মহৎ। বিশেষ করে তাঁর সহকর্মী মহলকে সর্বদিকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। দেশের নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি আদর্শবান হন, তাহলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে। তাঁদের আদর্শ নিয়েই গড়ে উঠবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষ। আর যদি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গলদ থাকে, তাহলে কোনকালেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। মুখে তারা যতই সাধু সাজতে চান জনতার কাছে আত্ম প্রকাশ পাবেই এবং জনতা তাদের রেহাই দেবে না। একটু থেমে বললো আবার সে—আশা করি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তথা কথিত পাকিস্তানের নেতাদের অবস্থা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, কাজেই হয়তো তেমন মহা ভুল আর এঁনারা করবেন না। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয় তেমনি চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির শাসনে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলার প্রতিটি মানুষ সজাগ হয়েছেন, তাই মনে হয় বাংলার নেতাগণ খাঁটি মানুষই হবেন। হাঁ একটা সমস্যা এখন বাংলার মানুষের ভাবনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে হলো পশ্চিম পকিস্তানের বাঙ্গালী সমস্যা, এরা সেখানে কি ভাবে আছে সঠিক কেউ জানিনা। সেখানে পশ্চিমা শাসক গোষ্টি বাঙ্গালীদের উপর ইচ্ছামত আচরণ করে চলেছে। অনেক বাঙ্গালীকে তারা ধরে নিয়ে যায় কিন্তু কোথায়, নিয়ে যায় কেউ জানেনা। তারা ফিরেও আসেনা আর। যে সব পরিবার থেকে তাদের কর্মদক্ষ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের অবস্থা একবার ভেবে দেখো। আরও একটা সংবাদ আমাকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে, সে হলো পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙ্গালী মেয়েদের নাকি ধরে নিয়ে গিয়ে গোপনে বিদেশে বিক্রি করা হচ্ছে—কথাটা শেষ না করেই থামলো হাসান, তার চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। দারুণ ক্রুদ্ধভাব তার ভিতরে ফুলে ফুলে উঠছে। উপরের দাঁতগুলো দিয়ে নিচের ঠোঁট খানাকে কাঁমড়ে ধরলো হাসান, হয়তো নিজকে সংযত করে নেবার চেষ্টা করছে সে।

বিস্ময় ভরা চোখে ক্যাপ্টেন হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। অদ্ভুত মানুষ এ হাসান ভাই।

পরদিন সকালে শামীমা এসে হাজির, আজ সে অনেক কথা নিয়ে এসেছে। বলবে শামীমা হাসানের কাছে। দু'চোখ তার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

আজ বেশ বেলা হয়ে গেছে তবু উঠেনি হাসান।

অন্যান্য ছেলেরা সবাই উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছে। প্রতিক্ষা করছে সবাই তাদের হাসান ভাইএর। সে এলে সবাই মিলে নাস্তা খাবে।

শামীমা হাসানের তাবুতে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়। বিছানা শূন্য পড়ে আছে হাসান নেই। তাকায় সে পাশের দড়িতে যেখানে ওর জামাটা ঝুলতো। জামাও নেই এমন কি জুতোও নেই তার।

হঠাৎ শামীমার দৃষ্টি পড়লো বিছানার পাশে একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে, শামীমা কাগজখানা হাতে তুলে নিতেই হীরা ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তরুণ তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে।

শামীমার হাতে একটি কাগজ অথচ তাঁবুর মধ্যে হাসান ভাই নাই। হীরা এগিয়ে যায়, বলে—শামীমা হাসান ভাই কোথায়?

শামীমা অশ্রু ছল ছল চোখ দু'টো তুলে তাকায় কোন জবাব দেয়না, শুধু হাত বাড়িয়ে কাগজখানা হীরার হাতে দেয়।

হীরা কাগজখানা পড়তে থাকে—প্রিয় ভাইয়েরা
—জানি তোমরা আমাকে খুঁজবে।
কিন্তু আমি এখন অনেক দূরে।
আর কোনদিন তোমাদের
মধ্যে ফিরে আসবো কিনা জানিনা।
তোমাদের ভালবাসা চিরদিন স্মরণ
থাকবে। হাঁ একটি কথা তোমাদের
অজ্ঞাতে আমাকে অনেক কাজ করতে
হয়েছে। দালালদের সায়েস্তা আমিই
করেছিলাম। ব্যবসায়ী মহলে আমি
আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলাম। উপযুক্ত
সাজা দিয়েছি যে যেমন কাজ করে-
ছিলো তেমনি। পশ্চিম পাকিস্তানের

বাঙ্গালীদের মুক্তির জন্য এখন আমার
সংগ্রাম চলবে। শামীমাকে আমার
ভালবাসা জানাবে। তোমরা আমাকে
হাসান ভাই বলেই জানো কিন্তু
আমার আসল পরিচয় তোমরা
জানোনা। আজ তোমাদের আমার
আসল পরিচয় জানালাম।
তোমাদের শুভাকাঙ্খী—

দস্যু বনহুর

হীরার চিঠি পড়া শেষ হতেই একসঙ্গে সবাই চিৎকার করে বলে উঠলো—হাসান ভাই দস্যু বনহুর!

হীরার দু'চোখ তখন অশ্রু ছল ছল করছে, বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে—হাসান ভাইএর আচরণেই আমি বুঝতে, পেরেছিলাম নিশ্চয়ই সে অন্যান্য সকলের মত সাধারণ মানুষ নন। তার প্রতিটি কথা হৃদয় স্পর্শ করতো। তার বলিষ্ঠ দীপ্ত চেহারা সবাইকে মন্ত্র মুগ্ধের মত আকৃষ্ট করতো। তার প্রতিটি কার্যকলাপ মানুষের মনে বিস্ময় জাগাতো.....

পরবর্তী বই
পাকিস্তানে দস্যু বনহুর

পাকিস্তানে দস্যু বনহুর – ৫৮

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

লাহোরের সব চেয়ে বড় এনং নাম করা হোটেল গুলবাগ। বিদেশী যত নামকরা লোকের আনাগোনা এই হোটেলে। হোটেলের সম্মুখে অগণিত মোটর কার দাঁড়িয়ে আছে।

অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে একটি নতুন ঝকঝকে কুইন কার এসে থামলো।

ড্রাইভ আসন থেকে ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। গাড়ি থেকে নামলো একটি সাহেবী পোশাক পরা যুবক মাথায় ক্যাপ, ঠোঁটের ফাঁকে দামী চুরুট।

গাড়ি থেকে ভদ্রলোক নামতেই দু'জন অভ্যর্থনাকারী তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

মনোরম হোটেল এই গুলবাগ। লাহোরের স্বর্গ বলে মনে হয়। ধপ ধপে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি আঠার তলা এই হোটেলটির চার পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত জায়গা। পাইন আর পাম্ গাছের বেষ্টনীতে হোটেলটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ফুলের টপ্ সাজানো। তাতে নানা রকম জানা অজানা ফুলের সমারোহ। কোন কোন জায়গায় শ্বেত পাথরে তৈরি প্রস্তর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ঝরণার পানি ঝরে পড়ছে সেই সব মূর্তির দেহের উপর। রৌদ্রের কিরণ পড়ে পানির বিন্দুগুলোকে মূর্তিগুলোর গায়ে হীরের টুকরোর মত মনে হচ্ছে।

মাঝ খান দিয়ে হোটেলের দিকে চলে গেছে সুন্দর মসৃণ পথ। পথের দু'পাশে অসংখ্য ফুলের গাছ; থোকা থোকা ফুলের উপর প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মাঝে কোথাও কোথাও পাথরাসন। পাথরাসনগুলো শ্বেত পাথরে তৈরি। সম্মুখে ফোয়ারা থেকে আসনের পাদমূলে পানি ঝরে পড়ছে।

সূর্যের আলোক রশ্মি সৃষ্টি করেছে রামধুনো।

অপূর্ব লাগে এ দৃশ্য।

হোটেলটির ঠিক দক্ষিণ পাশে সাঁতার কাটার জন্য পাথরে তৈরি জলাশয় বা স্নানাগার।

অনেকগুলো বিদেশী পুরুষ এবং নারী এই জলাশয়ে সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ রৌদে বসে গাটাকে গরম করে নিচ্ছে। সঙ্গিনী সহ কেউ বা হাসি তামাসায় মেতে উঠেছে। এক পাশে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করছে।

ভদ্রলোক হোটেলের সামনে আসতেই দু'জন তরুণী তাকে অভ্যর্থনা জানালো। এরাও হোটেলের অভ্যর্থনাকারিনী। অভ্যর্থনাকারী তরুণদ্বয় বিদায় নিলো, এবার তরুণীদ্বয় ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করে লিফটের দিকে অগ্রসর হলো।

ভদ্রলোক যে বিদেশী এবং ধনবান তাতে কোন সন্দেহ নাই। সুশ্রী সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। উজ্জ্বল দীপ্ত দু'টি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

তরুণীদ্বয় সহ লিফ্‌টে চেপে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

হোটেলের পাঁচ তলায় ১ নং ক্যাবিন বুক করা হয়েছে তার জন্য।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লিফ্‌ট পাঁচ তলায় চৌকাঠে এসে থামলো।

তরুণীদ্বয় প্রথম নেমে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন তাদের পিছনে।

আবার এগুলো তারা।

তরুণীদ্বয় আগে আগে চলেছে।

তাদের দু'জনাকে অনুসরণ করছেন ভদ্রলোক।

এবার তরুণীদ্বয় ১ নং ক্যাবিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

দরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো।

তরুণীদ্বয়ের একজন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ডাকলো—আসুন।

ভদ্রলোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বড় সুন্দর মনোরম ভিতরটা। ফিকে গোলাপী রং পাথর বসানো দেয়াল। পর্দাগুলোও ফিকে গোলাপী। এমন কি বিছানার চাদর, বালিশের কভার সব একই রং এর।

ভদ্রলোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন।

তরুণীদ্বয় তখনও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পাশে।

ভদ্রলোক এবার ফিরে তাকালেন তরুণীদ্বয়ের মুখের দিকে। এতোক্ষণ তিনি তেমন করে লক্ষ্য করেন নাই এবার দেখলেন তরুণীদ্বয় সুন্দরী বটে।

বয়স বাইশ বছরের বেশি নয়। মাথায় কোকড়া লালচে চুল রেশমের মত লাগছে। পরনে শাড়ি কিন্তু বড় আট সাট করে পরানো।

ভদ্রলোক বললেন—তোমরা এখন যেতে পারো।

তরুণীদ্বয় বেরিয়ে গেলো।

ভদ্রলোক মাথায় ক্যাপটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখলেন, দেহখানা এলিয়ে দিলেন সোফায়।

ড্রাইভার ততক্ষণে তার স্যুটকেসটা এনে রেখে গেছে।

এক সময় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, চুরুটটা এ্যাস্ট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে টাই খুলে ফেললেন তারপর কোট-প্যান্ট জামা। পরে নিলেন বিশ্রামের পোশাক।

এবার ভদ্রলোক বাথ রুমে প্রবেশ করলেন।

বাথ রুম থেকে বের হতেই দু'জন বয় তার কক্ষেই খাবার টেবিলে খাবার রেখে গেলো। যদিও অন্যান্যদের বেলায় এ নিয়ম নয় তবু ভদ্রলোকের জন্য পৃথক ধরনের ব্যবস্থা।

খাবারের মধ্যে ফলমূলই বেশীর ভাগ।

ভদ্রলোক তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছে খাবার টেবিলে বসলেন।

খেলেন তিনি। তবে ফলমূলটাই বেশি তাকে তৃপ্তিদান করলো।

এবার হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, রাত ন'টা বিশ মিনিট।

শরীরটা এলিয়ে দিলেন কোমল গোলাপী বিছানায়। চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক। চিন্তিত মনে ধূমপান করছেন। একরাশি ধোয়া কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক করছে তাঁর চার পাশে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেলো।

পদ শব্দে মুখ তুলতেই দেখলো ভদ্রলোক, একটি অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার এক থোকা গোলাপ।

ভদ্রলোক ফিরে তাকাতেই ফিক্ করে হেসে উঠলো তরুণী তারপর গোলাপের তোড়াটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

ভদ্রলোক ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে বললেন—ধন্যবাদ।

তরুণী পূর্বের ন্যায় হেসে বললো—শুভরাত।

কথাটা বলার সময় তরুণী আরও দু'পা সরে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। তার দেহ থেকে একটা সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে কক্ষ মধ্যে। ভদ্রলোক চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেন না, তরুণীর দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা

তীব্র আকর্ষণ ছিলো। কিছুক্ষণ নির্বাক নয়নে উভয়ে তাকিয়ে আছে উভয়ের দিকে।

সম্বিৎ ফিরে আসে ভদ্রলোকের, হেসে বলেন তুমি যেতে পারো।

তরুণীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। এ উপেক্ষা তার জীবনে যেন প্রথম। ধীরে ধীরে তরুণীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়লো। চোখ দুটো যেন চক চক করছে তার। তবু বললো তরুণী—ঐ যে সুইচ্ দেখছেন ওটা টিপলেই আমি আসবো। যদি কোন প্রয়োজন মনে করেন ডাকবেন।

ভদ্রলোক স্বাভাবিক কণ্ঠে হাস্য উজ্জ্বল মুখে বললেন—ডাকবো।

তরুণী তার জুতোর হিলে খুট খুট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলো।

ভদ্রলোক হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায় তারপর গোলাপী চাদর খানা বিছিয়ে নিলেন নিজের শরীরের উপর।

❑

হোটেল গুলবাগের এগারো তলার একটি কক্ষে কয়েকজন লোক বসে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। কক্ষের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

রাত তখন কমপক্ষে অনুমান দুটো হবে।

একজন অপর জনকে বললো—কতকগুলো বাঙ্গালীকে আজ তোমরা বন্দী শিবিরে আনতে সক্ষম হয়েছো ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললো—বিভিন্ন এলাকা থেকে ত্রিশজন পুরুষ আর আট জন মহিলা আমার বন্দী শিবিরে এনেছি। আগে আনা ছিলো দেড়শো জন।

প্রথম ব্যক্তি বললো—আগের বন্দী বাঙ্গালীদের মধ্যে কতজন মহিলা আছে?

বললো অপর একজন—মহিলা ছিলো পঁচিশ জন। বললো প্রথম ব্যক্তি—আরও বারো জন পুরো করে নাও তারপর চালান দেবো। হাঁ শোন অকেজো বয়সীদের.....হাত দিয়ে কিছু ইংগিতে বুঝিয়ে দিলো।

ইয়াসিন চোখ দিয়ে ইশারা করে বললো—তা আর বলতে হবে না আলী সাহেব। আগেরগুলো বাছাই করে সব অকেজোগুলোকে খতম করে দেওয়া হয়েছে।

আলী সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললো—ঠিক্ করেছো। তারপর আপন মনে বললো সে—সমস্ত পাকিস্তানে একটি বাঙ্গালী বাচ্চাকে জীবন্ত

রাখবোনা আমরা। তবে কিছু কিছু পয়সা যাতে আসে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠে।

আলী সাহেব রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো আমি আলী জাফরী বলছি.....হাঁ হাঁ আমরা ঠিক্ মতই কাজ করছি স্যার.....হাঁ সমস্ত পাকিস্তানে আমাদের লোক কাজ করছে.....তবে খুব হুঁসিয়ারের সঙ্গে.....কাজ করতে হচ্ছে.....জ্বি হাঁ.....জ্বি হাঁ.....না না এসব ব্যাপার বাইরে.....জ্বি বুঝতে পেরেছি.....বাইরের রাষ্ট্র মোটেই টের পাবেনা..... আমাদের লোক খুব সাবধানে কাজ করছে..... আচ্ছা.....হ্যালো.....চালান দেবো.....জাহাজ খানা করাচী "ড্রাইডক" বন্দরে থাকবে.....জি হাঁ মনে থাকবে.....আচ্ছা আচ্ছা.....সব খেয়াল থাকবে.....স্যার.....রাখবো স্যার.....আচ্ছা.....

রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসে আলী জাফরী। একটু বিশ্রাম নিয়ে বলে—তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কে আমার সঙ্গে কথা বললো?

সকলের পক্ষ হয়ে বললো—ইয়াসিন জ্বি হাঁ বুঝতে পেরেছি। আমাদের সরকারের প্রধান অধিনায়ক.....

এ সব কথা বার্তা উর্দূতে হচ্ছিলো। এরা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী লোক। এক একজনকে ধনকুবেরু বলে মনে হচ্ছে। পা জামা পাঞ্জাবী সেরোয়ানী পরা, মাথায় টুপি আছে কারো কারো।

আলী জাফরীর মুখে চাপ দাড়ি কপালে নামাজের কালো দাগ, চোখে সুরমার রেখা। দাঁতগুলো পানের রসে লালে লালে কালচে হয়ে উঠেছে।

এবার হাসলো আলী জাফরী, বললো—বাস্ থাক্ আর বলোনা। জানো তো দেয়ালেরও কান আছে।

জানি আলী সাহেব। বললো ইয়াসিন।

এবার আলী সাহেব বললো—তোমরা লাহোর বন্দী শিবির থেকে বাঙ্গালীদের কাঁসুর শিবিরে নিয়ে আসবে; সেখানে পুরুষদের বাছাই করে শুধু মেয়েদের নিয়ে করাচী ড্রাইডক বন্দরে দুই নম্বর ফ্লাটে যাবে। এবার আলী সাহেব ওদিকে চুপ করে বসে থাকা একজনকে লক্ষ্য করে বললো—আবদুল্লা।

নড়ে বসলো লোকটা। বললো সে—বলুন আলী সাহেব?

তোমার কাজ কেমন চলছে বললে না তো?

আবদুল্লা তার কর্কশ গলায় বললো—আমি ঠিক্‌ভাবে কাজ করছি। প্রত্যেকটা বাঙ্গালীর বাড়ি থেকে আমি সপ্তাহে একজন করে সরিয়ে নিচ্ছি এবং তাদের ঝাঁজরী বন্দী শিবিরে এনে বাছাই করে বিভিন্ন শিবিরে পাঠানো হচ্ছে।

আলী জাফরী এবার আর একজনকে লক্ষ্য করে বললো—ইয়াকুব তোমার খবর কি?

আমার খবর ঠিক্ আছে সাব। বললো ইয়াকুব।

দিনে কতগুলোকে তুমি খতম করছো? বললো আলী জাফরী।

একটু ভেবে নিয়ে ইয়াকুব তাচ্ছিল্যতার সঙ্গে বললো—প্রতিদিন দশ থেকে বিশজন পর্যন্ত চলে। বড় শয়তান বেয়াঁদব বাঙ্গালী আদমী। বড় কান্না কাটা করে.....

তোমার বুঝি খুব মায়া হয়?

মায়া হবে আমার? আলী সাহেব আমি দিনে আরও বহুৎ কাজ করতে পারি কিন্তু লোক পাইনা তো, কাদের জবাই করবো?

সাবাস। বড় আচ্ছা লোক তুমি। বহুৎ বখশীস্ মিলবে। বললো আলী জাফরী।

সে দিনের জন্য বৈঠক ভঙ্গ হলো।

❑

করাচী ড্রাইভ।

দু'নম্বর জেটি।

রাত তখন গভীর। একটা জমকালো জাহাজ দু'নম্বর জেটি থেকে ছাড়লো। রাতের অন্ধকারে জাহাজখানার নাম দেখা না গেলেও জাহাজখানার একটা নাম আছে।

জাহাজ খানার নাম শাহান-শা।

হীরু বন্দর ছেড়ে জাহাজ শাহান শা ধীরে ধীরে গভীর পানির দিকে ভেসে চলেছে জাহাজ খানা একটি মালবাহী জাহাজ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জাহাজ খানা জেটি ত্যাগ করবার পূর্বে অন্যান্য জাহাজের মত ভোঁ দেয় নাই। নীরবে ভেসে যাচ্ছে শাহানশা। জাহাজের সম্মুখে ডেকে দাঁড়িয়ে আলী জাফরী, আবদুল্লা ইয়াকুব আরও দু'তিন জন।

অনূকারেও আলী জাফরীর দাড়ি ভরা মুখখানাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পান সে এখনও চিবুচ্ছে।

একজন বললো—আলী সাহেব বন্দী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশ জন সামরিক অফিসার আছে। এদের কি খতম করে পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে?

আলী সাহেব রাগত কণ্ঠে বললো—এককথা তোমাদের বার বার বলতে হয় চিশতী। শাহান শা সবে তো জেটি ত্যাগ করলো। চলতে দাও সব হবে। আচ্ছা আবদুল্লা?

বলুন আলী সাহেব।

কতগুলো মেয়ে আজ এ জাহাজে আছে?

পঞ্চাশ জন মেয়ে লোক আছে।

মোটে পঞ্চাশ?

হাঁ। গত কয়েক দিন আগে প্রায় পাঁচ শো মেয়ে মানুষ আমরা চালান করেছি।

ইয়াকুব বলে উঠলো—করাচী বন্দর থেকে ঐ জাহাজ খানা রওয়ানা দিয়েছে কিন্তু এখনও পৌঁছানোর সংবাদ পাইনি। মালিক আবু তাহের পাঁচ শো মেয়ে মানুষের জন্য তিনি দু'লাখ দেবেন কথা হয়েছে।

আলী জাফর বললো—সবগুলি কি তরুণী ছিলো?

ইয়াকুব জবাব দিলো—ঠিক্ বলতে পারছিনা আলী সাহেব।

গর্জে উঠলো জাফরী—তা পারবে কেনো। বলেছি সব সময় সূক্ষ্মভাবে কাজ করবে। যখন এদের চালান দেবে তাদের হিসাব নিকাশ ঠিক রাখবে।

চিশতী বলে উঠলো—আলী সাহেব আর কতদিন এ ব্যবসা চলবে? বাংলাদেশের লোকজন বহুৎ ক্ষেপে গেছে। তারা পাগলের মত চিৎকার শুরু করেছে আত্মীয় স্বজনদের জন্য.....

অন্ধকারে আলী জাফরীর হাসির শব্দে জাহাজটা ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো—বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের চিৎকার করে গলা ফাটাতে দাও। পাকিস্তান থেকে একটিও বাঙ্গালীকে আমরা বাংলাদেশে যেতে দেবোনা। বাঙ্গালীরা আমাদের শুধু সর্বনাশই করেনি ওরা আমাদের

সব কিছু বরবাদ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ছিলো আমাদের সব চেয়ে বড় তাজা ব্যবসার জায়গা। বাংলাদেশে ব্যবসা করেই আমাদের পাকিস্তানের জৌলুস বেড়েছে। আমরা এখানের মানুষ এমনভাবে ফেঁপে উঠেছি আর আমাদের মাথায় ওরা কুঠার মারলো। একটা বাঙ্গালী জান নিয়ে ফেরৎ যেতে পারবেনা। হাঁ বিদেশীদের কিন্তু এ ব্যাপারে একটু জানতে দেওয়া হবেনা তাতে আমাদের পাক সরকারের বহুৎ বদনাম হবে।

চিশতীই বললো—তা যত সাবধানই আমরা হই না কেনো সব দেশ কিন্তু আমাদের আচরণ টের পেয়ে গেছে।

গর্জে উঠলো আলী জাফরী। তোমাদের বোকামীর জন্য অন্য দেশ টের পাচ্ছে বুঝলে?

চিশতী বললো—বাঃ এতোগুলো বাঙ্গালীকে আমরা তাদের বাড়ি থেকে রোজ নিয়ে আসছি অথচ তারা আর ফেরৎ যাচ্ছে না.....

চুপ করো। বোকামী সব বোকামী...কোন দেশ কোন রাষ্ট্র টের পাবে না। তোমরা বলবে এসো তোমাদের সবাইকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে খাবার নেই এটা নেই সেটা নেই এ সব তাল বাহানা দেখাবে।

আলী সাহেব—আপনার কথামতই তো কাজ করছি আমরা। যেমন প্রেসিডেন্ট আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খানের আদেশ মত টিক্কা খান, নিয়াজী খান, ফরমান আলী সাহেব বাংলাদেশের মানুষ নিধন যজ্ঞ শুরু করে ছিলেন আমরাও ঠিক্ তেমনি ঠান্ডা মাথায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি করে কাজ করছি। এক এক সময় এক এক এলাকায় বাড়ি ঘেরাও করে গাড়িতে তুলে নিচ্ছি.....

বেয়াদব এক বাড়ি থেকে সবাইকে তুলে নিচ্ছো? ধমকে উঠলো আলী জাফরী।

ইয়াকুব এবার কথা বললো—চিশতী ভুল বলছে। আমাদের সরকার তরফের যে ভাবে নির্দেশ হয়েছে ঠিক্ ঐ ভাবেই কাজ চলছে।

চিশতী বলে উঠলো—সরকার নির্দেশ দিয়ে দিলেন শুধু পুরুষদের সরাবেন কিন্তু আপনি যে মেয়েদের নিয়ে গোপনে ব্যবসা করছেন এটা কেউ জানে না।

আমি তা বলছিনা, বলছি এক বাড়ি থেকে একদিনে বেশি নেবেনা এতে পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা সবাই টের পাবে তা ছাড়া কথাটা অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রচার হয়ে যাবে। জানো এতো পাকিস্তানের কত বদনাম হবে?

চিশতী অন্ধকারেই একটু হেসে বললো—বদনাম! আলী সাহেব আপনি কি যেন বলেন। কার এতো বড় সাহস পাকিস্তানের বদনাম করে। দেখলেন না আমাদের খাঁনসেনাবাহিনী কেমন করে সোনার বাংলাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বীর বাহিনীর মত ফিরে.....না না বন্দী হলো, তবু পারলো কোন রাষ্ট্র বদনাম করতে?

চিশতী তুমি বড্ড ভুল কথা বলছো আজ। বুঝতে পারছিনা আজ তোমার কথাবার্তা এমন হয়েছে কি করে। আমি যা বললাম ঠিক্ বুঝতে পারোনি।

কে বললো পারিনি, আলী সাহেব ঠিক্ বুঝতে পেরেছি। আপনি বলেছেন এক একটা বাড়ি থেকে আকজন দু'জন করে সরাতে হবে, যেন ওরা কিছু বুঝতে না পারে, আর বলেছেন বাঙ্গালীদের খুব কষ্ট দিতে হবে মানে অভাবে ফেলতে হবে যাতে, ওরা বাড়ির মালিককে উপার্জনের জন্য বাইরে বেরুতে দেয় তখন অফিস থেকে বা রাস্তা থেকে.....বাস্ এই তো?

হাঁ এতোক্ষণে সব বুঝেছো দেখছি। আলী জাফরী বললো।

ইয়াকুব বললো—আলী সাহেব আমাদের জাহাজ এখন কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে বলবেন কি?

হাঁ এখন সব বলবো। জানো তো সরকারের কড়া আদেশ কোন কথাই আগে কাউকে জানানো চলবেনা কারণ দেয়ালেরও কান আছে।

চিশতী বললো—সরকার কিন্তু যতই ব্যাপরটা গোপন রাখতে চান না কেনো সত্য কোনদিন গোপন থাকবে না। যেখানেই আমরা কথা বলি দেয়াল থাকবেই, না হলে থাকবে আলো বাতাস। কাজেই.....

চুপ করো চিশতী। তুমি বড্ড আজে বাজে বকো। ক্যাবিনে চলো অনেক কথা আছে।

এগুলো আলী জাফরী।

তাকে অনুসরণ করলো তার দলবল।

জাহাজ শাহান-শা তখন বৃহৎ আকার জন্তুর মত সমুদ্র বক্ষ ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। জাহাজখানা যাত্রীবাহী নয় মাল বাহী জাহাজ। নিভৃত একটি ক্যাবিনে এসে বললো সবাই।

ক্যাবিনটা জাহাজের তলদেশে তাতে কোন সন্দেহ নাই। একটা লাল রং এর আলো জ্বলছে।

আলী জাফরী একটা লোহার চেয়ারে বসে পড়লো।

অন্যান্য সবাই দাঁড়িয়ে রইলো।

দু'জন লোক দুটো কাঠের ট্রেতে করে কয়েক কাপ চা আর খাবার রেখে গেলো আলী জাফরীর সম্মুখে।

আলী জাফরী বললো—নাও চা আর খাবার খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করে নাও তারপর কাজের কথা হবে।

আলী জাফরীর কথায় এক এক জন এক একটা কাপ তুলে নিলো হাতে।

চা পর্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হলো।

আলী জাফরী দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে বললো—বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ক'জন আছে বলো ইয়াকুব?

ইয়াকুব চটপট জবাব দিলো—বিশ জন ও জাহাজে আছে।

ইয়াসিন বললো—আলী সাহেব এরা এক একটা কেউটো সাপ। যদি এরা কোনক্রমে বাংলাদেশে ফিরতে পারে তা হলে পাকিস্তানের বিপদ ঘনিয়ে আসবে সন্দেহ নাই।

সে সুযোগ কেউ পাবে না। আজ যারা শাহান-শা জাহাজে বন্দী আছে তাদের সবগুলোকে হাত পা বেধে সমূদ্রে ফেলে দিতে হবে। হাঁ ফেলে দেবার পূর্বে প্রত্যেকের চোখ দু'টোকে উপড়ে তুলে দিতে হবে।

বহুৎ আচ্ছা। বললো ইয়াসিন।

চিশতী বলে উঠলো—শুধু চোখ তুলে কি হবে আলী সাহেব হাত পাগুলোও কেটে ফেলা ভাল। কারণ কোনক্রমে যদি সাঁতরে বেঁচে যায়।

হাঁ ঠিক্ বলেছো চিশতী। ইয়াসিন সমুদ্রে নিক্ষেপ করবার পূর্বে ওদের হাত পা গুলোকেও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

আচ্ছা ওস্তাদ।

বলে উঠে এবার আবদুল্লা—আমাদের জাহাজখানা এখন কোথায়, কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আলী সাহেব?

হাঁ এবার সেই কথাই বলবো।

ক্যাবিনের সবাই আগ্রহভরা চোখে তাকালো আলী জাফরীর মুখে।

চিশতী বলে উঠলো—ওস্তাদ এর আগে আমাদের যে বাঙ্গালী বন্দী চালান গেছে সে ঠিকানাটা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো আলী জাফরী—তোমার মত বেকুফ লোক নিয়ে কাজ হবেনা। এরি মধ্যে ভুলে গেছো চিশতী, আমাদের মাল কোথায় গিয়ে জমা হচ্ছে?

মানে আমার মাথাটা ইদানিং বেশি গন্ডোগোল করছে কি না—বলুন না আলী সাহেব?

আলী সাহেব পূর্বের ন্যায় রাগত কণ্ঠে বললো—ইয়াকুব তুমি বলো।

ইয়াকুব বললো—এতো বড় কথা ভুলে গেছিস্ বেটা? সব মাল গিয়ে জমা হচ্ছে গাদান বন্দরে। সেখানে বাছাই করে চালান যাবে বিভিন্ন দেশে।

আলী জাফরী বলে উঠলো—গাদান বন্দরে পৌঁছবার পূর্বে হাসনাবাদ বন্দরে।

আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করবে সেখানে কিছু বাঙ্গালী বন্দী উঠবে। হাঁ এবার বন্দী বাঙ্গালীদের দেখা যাক।

ইয়াকুব বললো– আপনি এখনও শাহান-শার আটক বন্দী বাঙ্গালীদের স্বচক্ষে দেখেনি ওস্তাদ। চলুন দেখবেন চলুন।

চিশতী বললো—ওদের এখানে নিয়ে এলেই ভাল হতো কারণ আপনার কষ্ট হবে যে ওস্তাদ।

চিশতী এই সামান্য কষ্ট আমি করতে পারবোনা মনে করো তুমি। হাসলো আলী জাফরী।

উঠে দাঁড়ালো জাফরী, বন্দীদের দেখবার জন্য পা বাড়ালো ক্যাবিনের বাইরে।

তার দল বল আবদুল্লা, ইয়াসিন, ইয়াকুব আর চিশতী তাকে অনুসরণ করলো।

জাহাজখানা ভর্তি ছিলো শুকনো মাছ।

একটা ভোটকা তীব্র গন্ধ জাহাজটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাইরের লোক জানে এটা ড্রাইডকের জাহাজ এতে করে দেশ বিদেশে শুকনো মাছ চালান যায়। কে জানে শুকনো মাছের বস্তার তলায় জাহাজের খোলের মধ্যে রয়েছে অগনিত বাঙ্গালী বন্দী নারী পুরুষ।

সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো ওরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে এসে দাঁড়ালো সবাই। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। অন্ধকার খোলের মধ্যে দু'শত বাঙ্গালী নারী পুরুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। একটা ভোটকা গন্ধ সমস্ত খোলটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেন

দম আটকে আসছে যেন। কয়েকটা ছোট্ট বালক ছিলো তারা ক্ষুধার পিপাসায় কান্নাকাটি শুরু করেছে। বন্দী বাঙ্গালীদের হাত পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। এক এক জনের চেহারা কঙ্কালের মত হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে, চুল এলোমেলো রুক্ষ। জামা কাপড় ময়লা এবং ছেঁড়া।

আলী জাফরী সম্মুখে, পিছনে তার দলবল।

জাহাজের খোলসের মধ্যে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোতে সবার উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—ইয়াকুব?

সম্মুখে সরে এসে দাঁড়িয়ে বললো—ওস্তাদ।

এদের মধ্যে নারীগুলোকে বেঁছে বের করে নাও।

আচ্ছা ওস্তাদ।

সামরিক অফিসারগুলোকে বেছে নেবো আলী সাহেব? বললো ইয়াসিন।

আলী জাফরী বললো—না এখন এদের নয়। হিন্দ বন্দরের কাছাকাছি আরব সাগরে এদের নিক্ষেপ করবে। কথাগুলো আলী জাফরী এমনভাবে বললো জাহাজের খোলের সকল বন্দীই তার কথা শুনতে পেলো।

বাঙ্গালী বন্দীদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত ভাব জেগে উঠলো। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

জাফরী বললো—ইয়াকুব মেয়েদের বেছে নিয়ে উপরে নিয়ে এসো। কথাটা বলে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে বসলো সে।

সবাই রয়ে গেলো বন্দীদের মধ্য থেকে মেয়েগুলোকে বেছে নিতে হবে।

চিশতী বললো ইয়াকুব ভাই বাচ্চাগুলো কাঁদছে কেনো?

বোকাটা জানোনা ওদের খিদে পেয়েছে।

তা আমি কেমন করে জানবো। কারণ আমার তো আর খিদে পায়নি।

তোর খিদে পাবে কেনো, ঘন্টায় ঘন্টায় খাচ্ছিস যে। পাউরুটী, চা, কফি মাংস আর ওদের তিনদিন কিছু খেতে দেওয়া হয়নি।

তিনদিন ওরা খায়নি বলো কি ইয়াকুব ভাই?

চিশতী তুই আজ কেমন যেন কথাবার্তা বলছিস্। তুই কি জানিস না? আজ নতুন এলি নাকি?

জানি তবু ভুলে যাই মাথাটা যেন আজকাল কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। শোন ইয়াকুব ভাই রাত আর বেশি নাই ভোর হলেই আমরা কাজ শুরু করবো। তখন মেয়েদের বেছে নিয়ে আলী সাহেবের সামনে হাজির করা হবে।

মন্দ বলোনি চিশতী, ভোর রাতে একটু ঘুমিয়ে নেই চলো।

ইয়াকুব ভাই আমাকে কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে।

এরই মধ্যে খিদে পেলো? যাও খেয়ে এসোগে।

কিন্তু একা একা খাবো তোমরা খাবেনা?

আমাদের খিদে পায়নি।

তবে আমার সঙ্গে একটু চলোনা ভাই। দাড়িয়ে হাত বুলায় চিশতী।

ইয়াকুব রাগত কণ্ঠে বলে—আমি ঘুমিয়ে নেবো, তুমি ইয়াসিনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

ইয়াসিন বললো—চলো আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

ইয়াসিনের কথা শুনে খুশি হলো চিশতী।

ওরা দু'জন চললো খাবার ঘরের দিকে।

চিশতী চলতে চলতে বলে—তুমি আগে আগে চলো ভাই।

কেনো রে ভূতের ভয় করছে নাকি?

হাঁ ভাই।

অমন জোয়ান বলিষ্ঠ চেহারা তার আবার ভয়। চল্ আমি আগে আগে যাচ্ছি।

এক সময় খাবার ক্যাবিনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

তখন খাবার সময় নয় বলে বাবুর্চিদল ঘুমিয়ে পড়েছে। ইয়াসিন বললো—যাও ভিতরে বসে খেয়ে নাও যা পারো।

তুমি খাবেনা ইয়াসিন ভাই?

আমি অমন পেটুক নই। তোমার খিদে পেয়েছে যাও আমি ততক্ষণে ঘুমিয়ে নেই গে। ভোর হবার আর বেশি দেরী নাই। চলে যায় ইয়াসিন।

চিশতী ক্যাবিনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রচুর পাউরুটি মাখন আর বিস্কুট সাজানো রয়েছে, সব দেখলো সে। তাকিয়ে দেখেনিলো চারিদিকে কেউ আছে কিনা। না কেউ নেই, ওদিকে দু'জন কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

চিশতী দ্রুত হস্তে কিছু পাউরুটি আর বিস্কুট মাখন নিয়ে একটা চাদরে বেঁধে নিলো তারপর যেমন সে বের হতে যাবে অমনি বাবুর্চিদের একজন চিশতীর পদশব্দে জেগে উঠলো। চিশতীর কাঁধে পুটলী দেখে বললো—কি হচ্ছে চিশতী ভাই এতো কি নিয়েছো? চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াতেই চিশতী পুটলী রেখে ওকে ধরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে মুখে রুমাল গুঁজে দেয় যেন সে

চিৎকার করতে না পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জেগে উঠবার আগেই চিশতী ওকে কাঁদে তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করে সমুদ্রের মধ্যে। ততক্ষণে দ্বিতীয় জন জেগে উঠে হতভম্বের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। চিশতী প্রথম জনকে সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করেই দ্বিতীয় জনকে তুলে নেয় কাঁধে ওকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দেয় রেলিং এর উপর দিয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির মধ্যে।

এবার চিশতী পাউরুটী আর বিস্কুটের পুটলীটা কাঁধে তুলে নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো বাহিরে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঠিক্ বন্দীদের ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করলো।

বন্দীরা ক্ষুধায় পিপাসায় এতো কাতর ছিলো যে তাদের চোখে ঘুম ছিলোনা। তাছাড়া জানালা বিহীন বন্ধ ক্যাবিনে অসহ্য যন্ত্রনার মধ্যে কি কেউ ঘুমাতে পারে।

চিশতী ক্যাবিনে প্রবেশ করে চাপা গলায় বললো—এতো খাবার আছে আপনারা সবাই খেয়ে নিন। আমি আপনাদের হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছি।

চিশতী দ্রুত বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিলো।

বন্দী বাঙ্গালীগণ ভেবে পাচ্ছেনা এ লোকটার হঠাৎ এমন দয়া দেখাবার কারণ কি? তবে কি কোন উদ্দেশ্য আছে। এ সব খাবারে কি কোন রকম বিষ মেশানো আছে। কিন্তু বন্দীরা এতোবেশি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল কারো বেশিক্ষণ এ ব্যাপার নিয়ে ভাববার সময় নাই। হাতের বাঁধন মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে সবাই খেতে শুরু করলো।

চিশতী নির্বাক নয়নে একদন্ড তাকিয়ে দেখলো ওরা কি ভাবে খাচ্ছে। বললো—আপনারা এমন ভাবে খাবেন যেন ক্যাবিনের মেঝেতে কিছু পড়ে না থাকে। আমি আপনাদের জন্য খাবার পানি আনছি।

বেরিয়ে গেলো চিশতী।

অল্পপরে বালতী ভরা পানি নিয়ে হাজির। চিশতী নিজের হাতে গেলাস ভরে সবাইকে পানি খাওয়ালো। তারপর আবার সবাইকে যেমন বাধা ছিলো তেমনি করে বেঁধে ফেললো। বললো—খবরদার কেউ যেন একথা প্রকাশ করবেনা।

কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো চিশতী। যাবার সময় বন্দীদের ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে গেলো সে ঠিক্ যেমন ছিল তেমনটি করে।

পূর্বাকাশ তখন সবে মাত্র ফর্সা হতে শুরু করেছে।

চিশতী গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়লো। অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেংগে গেলো চিশতীর। ধড়ফড় করে উঠে বসতেই ইয়াকুব বললো—একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেছে চিশতী।

অবাক চোখে তাকিয়ে বললো চিশতী—তাজ্জব ব্যাপার তার মানে?

দেখবে এসো হামিদ আলী আর করিম হোসেন সব খাবার নিয়ে উধাও হয়েছে।

বলো কি?

হাঁ! খাবার ক্যাবিনে সামান্য কিছু খাবার আছে আর সব গায়েব।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছেনা।

ইয়াসিনও বলে উঠলো—দেখবে চলো।

চিশতী বললো—আমি যখন একটা পাউরুটী খেয়ে বেরিয়ে এলাম তখন প্রচুর খাবার দেখেছি।

তুমি আর ক'টা খেয়েছো। বললো আবদুল্লা।

এবার সবাই মিলে ঐ ক্যাবিনটার মধ্যে প্রবেশ করলো, যে ক্যাবিনে প্রচুর খাবার ছিলো।

চিশতী দু'চোখ কপালে তুলে বললো—ঠিক্ হামিদ আলী আর করিম হোসেনের কাজ, না হলে এতো রুটী মাখন বিস্কুট গেলো কোথায়?

কিন্তু কেউ সাহসী হচ্ছেনা ব্যাপারটা আলী জাফরীকে জানাতে। সবাই নিজে নিজেই বলা কওয়া করতে লাগলো।

ওদিকে বেলা প্রায় আটটা বেজে চললো।

আলী জাফরীর নাস্তা খাবার সময় হয়ে গেছে। বার বার একে ওকে ডাকা ডাকি করে হয়রান পেরেশান। কেউ আসছেনা ব্যাপার কি, রেগে আগুন হয়ে নিজেই সে এগুলো। খাবার ক্যাবিনের কাছে এসে সব শুনে চক্ষুস্থির। এতো খাবার গেলো কোথায় এবং বাবুর্চি দু'জনই বা কোথায় উঠে গেলো। এটা তো শুকনো পথ নয় যে পালিয়েছে। এখন জাহাজখানা আরব সাগরের বুকচিরে এগুচ্ছে। চারিদিকে শুধু জলরাশি থৈ-থৈ করছে।

আলী জাফরী ও তার দলবল সবাই ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো। অনেক ভেবেও কেউ কোন সমাধান খুঁজে পেলোনা। সমস্ত জাহাজ খানাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কোথাও পাওয়া গেলোনা বাবুর্চিদ্বয়কে।

খাবার ক্যাবিনে যা খাবার আছে তা বড় জোর দু'একদিন চলতে পারে কিন্তু তার পর কি হবে। আলী জাফরী ভীষণ চিন্তায় পড়লো।

সামনে কোন বন্দর নাই, দু'দিন তাদের সম্পূর্ণ না খেয়ে কাটাতে হবে।

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটায় আলী জাফরী ঘাবড়েও গেছে কিছুটা। গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে তাদের সময় লাগবে। আলী জাফরী যা খাবার আছে খুব হুশিয়ারের সঙ্গে সবাইকে ভাগ করে খেতে বললো এবং দুদিনের জন্য রাখতে বললো।

ঐদিন মনের অবস্থা ভাল না থাকায় মেয়েদের বাছাই বন্ধ রাখলো।

শয়তান আলী জাফরীকে একটা উদ্বিগ্নতা আচ্ছন্ন করে তুলেছে। যে বাঙ্গালী বন্দীদের নিয়ে সে এখন চলেছে তাদের জন্য সে বহু টাকা পাবে কাজেই এ ব্যাপারে সে একটু বিচলিত হলো বটে।

আবার রাত এলো আবার দিন হলো।

জাহাজ শাহান শা আরব সাগর পাড়ি দিয়ে হাসানাবাদ বন্দরের দিকে এগুচ্ছে।

আলী জাফরী তার সঙ্গী ইয়াকুব, আবদুল্লা, ইয়াসিন ও চিশতীকে ডেকে বললো—তোমরা এবার কাজ শুরু করে দাও। সামরিক অফিসার বিশজনকে খতম করে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারপর বন্দীদের মধ্য থেকে মেয়েদের বেছে নিয়ে পৃথক ক্যাবিনে রাখো। হাসানাবাদ থেকে আরও কিছু মাল উঠবে। পকেট থেকে একটা রিসিট বের করে মেলে ধরলো—হাসানাবাদ থেকে মাল উঠার পর এ রিসিটটা ওদের দিয়ে দিতে হবে। এতে লিখে দিতে হবে কত মাল আমরা সেখানে পেলাম।

চিশতী বললো—ওরা নগদ টাকা চাইবেনা তো?

না, টাকাটা সরকার ব্যবস্থা করবে। আমরা শুধু এই রসিদটা দিয়ে দেবো।

চিশতী করতালি দিয়ে বললো—আমাদের সরকার কত মহৎ কত হৃদয়বান। এমন সূক্ষ্মভাবে বাঙ্গালীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন যার জন্য আমরা দুটো পয়সার মুখ দেখছি!

আলী জাফরী বললো—বাংলা মুলুকে ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলো এখন পাকিস্তানী বেচারীরা দুটো খেয়ে বাঁচবো। কিন্তু খুব হুশিয়ার বাংলা মুলুকে আমাদের খাঁন সেনা-বাহিনী নেতারা যেমন ঠান্ডা মাথায় কাজ করেছে তেমনি ঠান্ডা মাথায় তোমরা কাজ করবে.....

ইয়াকুব কিছু বলতে যাচ্ছিলো মাঝখানে বলে উঠলো—চিশতী জনাব আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খান তার অনুচরদের.....মানে সৈন্য সামন্তদের ঠান্ডা মাথায় কাজ করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনিও আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন কাজেই ভুল হবেনা জনাব.....

জনাব নয় ওস্তাদ বলো—ওস্তাদ.....

হাঁ ভুল হয়েছে ওস্তাদ।

যাও তবে কাজ শুরু করো গে।

চিশতীই বলে উঠে—চোখ উপড়ে হাত পা গুলো কেটে ফেলতে হবে না ওস্তাদ?

হবে—হবে এরি মধ্যে ভুলে গেছো সব।

ইয়াকুব বলে উঠলো—চিশতী ভুললেও আমরা কিন্তু ভুলিনি ওস্তাদ।

যাও তবে।

চিশতী বললো—সকালের নাস্তাটা খেয়ে নেবার পর কাজ শুরু করবো আমরা।

তোমাদের খিদেটা যেন বেড়ে গেছে চিশতী। খাবার নেই বলেই তোমাদের বুঝি এতো খিদে পাচ্ছে। যাও খেয়ে নাও গে।

আলী সাহেব আপনার খাবারটা.....বললো চিশতী।

আলী জাফরীর মনেও খাবার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো কারণ দু'দিন সেও অন্যান্যদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে কম করে খেতে হয়েছে। বললো—পাঠিয়ে দাও গে।

আচ্ছা আমিই নিয়ে আসবো।

অন্যান্য সহ চিশতীও বলে গেলো।

খাবার ক্যাবিনে প্রবেশ করে বললো চিশতী—তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে কাজেই তোমরা বসো, আমি তোমাদের খাবার নিয়ে আসছি।

ইয়াকুব বললো—চিশতী তুমি বড্ড ভাল আদমী, যাও ভাই নিয়ে এসো।

হাঁ তোমরা সবাই এখানে সার হয়ে বসে যাও।

চিশতী ওদের সকলকে বসিয়ে দিয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। অল্পক্ষণে একটা বড় থালায় পাউরুটী আর মাখন নিয়ে ফিরে এলো। রাখলো ওদের সামনে—নাও এবার তোমরা খাও আমি আলী সাহেবের খাবারটা তার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ইয়াকুব, ইয়াসিন, আবদুল্লা এরা খেতে শুরু করলো।

চিশতী বললো—দেখিস ভাই তোরা সব খেয়ে ফেলিস না যেন। আমার জন্য কিছু রেখে দিস কিন্তু।

চিশতীকে লক্ষ্য করে বললো আবদুল্লা—ঝট্ পট্ চলে আয় নইলে ফাকি পড়বি।

ওরা খেতে শুরু করলো চিশতী একটু হেসে খাবারের থালা নিয়ে ওস্তাদ আলী জাফরীর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। আলী জাফরী তখন লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে।

চিশতী বললো—খেয়ে নিন ওস্তাদ।

হুশ হলো চিশতীর ডাকে, বললো—আচ্ছা খাচ্ছি তুমি যাও।

খেতে শুরু করেন ওস্তাদ আমি নিজের চোখে দেখে যাই।

তোমাকে সাধে কি আর বেকুব বলি। খাচ্ছি-খাচ্ছি.....

না ওস্তাদ খেয়ে নিন।

এবার আলী জাফরী খেতে শুরু করলো।

চিশতী মুচকী হেসে বেরিয়ে গেলো।

এখানে এসে দেখে ওর গায়ে ঢলে পড়ে আছে। আবদুল্লার গায়ে ইয়াসিন, ইয়াসিনের গায়ে ইয়াকুব। সম্মুখের থালায় একটুও খাবার নাই, সব ওরা খেয়ে ফেলেছে দেখে খুশি হলো চিশতী।

এবার চিশতী ওদের হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো মজবুত করে তারপর এক একজনকে তুলে নিয়ে আরব সাগরে নিক্ষেপ করলো অনায়াসে। ওদের সাগরে ফেলে ফিরে এলো চিশতী আলী জাফরীর ক্যাবিনে।

দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলো আলী জাফরী মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাতালের মত টলছে। তার হাতে একখানা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। চিশতীকে দেখেই চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো।

চিশতী ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আলী জাফরীর মুখে।

আলী জাফরী চিশতীকে লক্ষ্য করে ছোরাসহ হাত খানা তুলতে গেলো, কিন্তু পারলোনা তার দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ক্যাবিনের মেঝেতে। একটা শব্দও বের হলোনা তার মুখ থেকে।

এবার চিশতী আলী জাফরীর হাতের শিথীল মুঠা থেকে ছোরাখানা খুলে নিলো, সজোরে বসিয়ে দিলো ওর বুকে।

রক্তের ফোয়ারা ছুটলো।

চিশতী আপন মনে বলে উঠলো—শয়তান, তুই যত পাপ করেছিস এটুকু শাস্তি তার জন্য যৎসামান্য মাত্র.....এবার চিশতী জাফরীর দেহটা টেনে নিয়ে ফেলে দিলো সাগর বক্ষে।

চলন্ত জাহাজের উপর এতো ঘটনা ঘটে গেলো জাহাজের চালক ও সারেং কিছু জানতে পারলোনা। জাহাজ চলেছে।

এবার চিশতী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে, জাহাজের খোলের মধ্যে যেখানে বন্দীকরে রাখা হয়েছে বাঙ্গালী বন্দীদের।

বন্দীদের ক্যাবিনে প্রবেশ করে চিশতী দরজা সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেললো। তারপর বললো—আপনার বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, এবার সবাই বেরিয়ে আসুন।

বাঙ্গালী বন্দীগণ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। ভাবলেন এটা একটা নতুন কোন মতলব। কিন্তু পরক্ষণেই চিশতীর সেদিনের ব্যবহারের কথা মনে পড়লো। সেই তো সেদিন পেট ভরে রুটী মাখন খেতে দিয়েছিলো না হলে ওরা আজ মরে যেত। চিশতীর কথায় সবাই যেন আশার আলো দেখতে পেলো, এক এক করে বেরিয়ে এলো জাহাজের খোলের ভিতর থেকে বাইরের আলোতে।

চিশতী সবার হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিতে লাগলো—এক এক করে। পা বাঁধাছিলোনা কারো কারণ তাদের পায়ের বাঁধন জাহাজে তোলার একদিন পর খুলে দিয়েছিলো।

সবাই জাহাজের উপরে মুক্ত আকাশের তলায় সচ্ছ আলো বাতাসে এসে দাঁড়ালো। তারা প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা তারা মুক্ত। অবাক হয়ে গেছে সবাই কে এই লোক যার এতো দয়া, যে এতো মহৎ।

চিশতী বললো—আপনারা খুব বিস্মিত হয়ে গেছেন বুঝতে পারছি কিন্তু সব বলার সময় এখন নয়। মনে করুন আমি আপনাদেরী একজন বন্ধু। আর বিশ্বাস করুন আপনারা সম্পূর্ণ মুক্ত।

বাঙ্গালী বন্দীগণ জ্ঞানী বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। তারা অবাক হয়ে গেছে, ভেবে পাচ্ছেনা কি ঘটলো বা কি ঘটছে। মৃত্যুর জন্য রাত প্রহর গুণছিলো, এভাবে উদ্ধার পাবে এ স্বপ্নের মত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। খুশিতে সবার

চোখে পানি আসছে। কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চিশতীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো।

চিশতী বিব্রত বোধ করছে তবু বললো—আপনারা এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নন যতক্ষণ আপনারা কোন বিদেশে গিয়ে না পৌঁছবেন। তবে আমি আশা করি আর কোন বিপদ আসবেনা। এখন আপনাদের মধ্যে দু'জন কেউ আমাকে সাহায্য করতে হবে কারণ এখনও এ জাহাজের চালক ও সারেং শত্রু পক্ষের লোক।

চিশতীর কথায় কয়েকজন পুরুষ একসঙ্গে এগিয়ে এলো, সবাই বললো—আমরা সকলে তোমাকে সাহায্য করবো ভাই।

চিশতী হেসে বললো—এতোজনকে এখন লাগবেনা তবে যদি দরকার পড়ে তখন বলবো। আপনাদের মধ্যে দু'জন সামরিক অফিসারকে পেলে ভাল হয়।

দু'জন সামরিক অফিসার এগিয়ে এলো।

একজন বললো—কি করতে হবে বলো ভাই?

চিশতী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—আসুন আমার সঙ্গে। হাঁ তার আগে আপনাদের আমি কয়েকটা কথা বলবো। চলুন ঐ ক্যাবিনটার মধ্যে চলুন।

সবাই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, ক্যাবিনটা খুব ছোট নয় বেশ বড় সড়।

চিশতী সকলকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বটে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত হননি কাজেই আপনাদের সাবধানে থাকতে হবে। যারা আপনাদের বন্দী করে বিদেশে চালান দেবার জন্য এ জাহাজে করে নিয়ে যাচ্ছিলো আমি তাদের খতম করেছি। তবে এখনও এ জাহাজের চালকরা তাদেরই লোক আছে। এরা এখনও কিছু জানেনা। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সব সময় সাবধানে এই ক্যাবিনের মধ্যে থাকবেন। আমি দু'জন সামরিক অফিসারকে নিয়ে জাহাজের ইঞ্জিনের দিকে যাচ্ছি। চালক ও সারেং দু'জনকে আমাদের আয়ত্ত্বে রেখে কাজ করে যেতে হবে। হাঁ আমাদের জাহাজে এখন কোন খাবার না থাকায় আপনাদের কষ্ট হবে এবং আমি আশা করছি সে কষ্টকে আপনারা সহ্য করে নেবেন।

একসঙ্গে সবাই বলে উঠলো—আমরা বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি এখন সব আমরা সহ্য করবো। সব কষ্ট আমরা মাথা পেতে নেবো।

আবার চিশতী বললো—আমাদের জাহাজ আজ সন্ধ্যায় হাসনাবাদ বন্দরে পৌঁছবে। সেখানে পাক-সরকারের দালালরা আরও কিছু বাঙ্গালী বন্দী এ জাহাজে উঠাবে। ঐ সময়টা আমাদের অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ সময় কারণ তারা এ জাহাজের মালিক কে খুঁজবে। কিন্তু তারা তাকে পাবেনা, আমি তাকে সরিয়ে ফেলেছি। ঐ সময়টা উতরে গেলেই আপনারা নিশ্চিন্ত। বেশিক্ষণ আপনাদের সঙ্গে এখন আলাপ করার সময় নাই। সামরিক অফিসারদ্বয় সহ বেরিয়ে যায় চিশতী।

চিশতী একটা নিভৃত জায়গায় এসে দাঁড়ায়। একটা শুকনো মাছের বস্তার তলা থেকে দুটো পিস্তল বের করে দু'জন সামরিক অফিসারের হাতে দিয়ে বলে—আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। জাহাজ হাসনাবাদ বন্দরে নোঙ্গর করলে জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয়কে এই অস্ত্রদ্বারা আয়ত্বে রাখতে হবে। আর আমি চালিয়ে নেবো সব বুঝতে পারলেন তো?

একজন সামরিক অফিসার বললেন—সব বুঝছি। কিন্তু আবার কোন বিপদ না এসে পড়ে তাই ভাবছি।

হাঁ সে কথা মিথ্যা নয়। যাক্ আপনাদের দু'জনার নাম জানা দরকার, আমার নামটাও জেনে রাখুন—আমার নাম চিশতী। অফিসারদ্বয়ের একজন বললেন—আমার নাম আলন কাওসার।

অপর জন বললেন—আমার নাম জলিল হাফেজ।

আচ্ছা, যান এখন আপনারা বিশ্রাম করুণ গে। মনে রাখবেন সন্ধ্যার পর পরই আমাদের জাহাজ হাসনাবাদ বন্দরে পৌঁছে যাবে।

❑

জাহাজ শাহান শা হাসনাবাদ বন্দরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই চিশতী বলে দিলো এবার আপনারা জাহাজের ইঞ্জিন কক্ষে যান, কোন ক্রমেই চালক ও সারেংদ্বয় যেন ইঞ্জিন কক্ষ থেকে বাইরে না আসতে পারে। আমি এদিকে চালিয়ে নেবো।

জাহাজ জেটিতে ভিড়তেই জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয় বাইরে আসবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় তারা দেখলো অপরিচিত দু'জন বাঙ্গালীলোক ইঞ্জিনের দরজায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে।

একজন বললো—খবরদার একপা নড়না—কিংবা বাইরে বেরুতে চেষ্টা করোনা।

জাহাজ শাহান শার চালক খুব বয়সী লোক ছিলো, সে সাহস করে বললো—কে তোমরা?

সারেংদ্বয় ভয় পেয়ে গেছে রীতিমত। তারা বুঝতে পারছেনা কি ব্যাপার ঘটেছে। গত সময় গুলি তার মনোযোগ সহকারে জাহাজ চালনার কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই কারণে অন্য কোন দিকে তাদের খেয়াল দেবার সুযোগ হয়নি। জাহাজে কি ঘটেছে না ঘটেছে তারা টের পায়নি। হঠাৎ দুজন অপরিচিত লোককে পিস্তল হাতে এভাবে দেখে হক চকিয়ে গেলো তারা। কেউ এগুতে সাহসী হলোনা।

ওদিকে জাহাজ হাসনাবাদ বন্দরে ভিড়তেই দু'জন ধনকুবেরু ধরনের লোক প্রায় ত্রিরিশজন বাঙ্গালী বন্দী নারী পুরুষ এনে হাজির করে। তারা আলী জাফরীর সঙ্গে দেখা করে রিসিট চায়।

চিশতী ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—তিনি হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কাজেই কারো দেখা করা সম্ভব নয়। সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমাকেই দিয়েছেন।

যারা বাঙ্গালী বন্দী নারী পুরুষদের নিয়ে এসেছিলো তারা চিশতীর কাছে রিসিট নিয়ে বিদায় হয়। আলী জাফরীর পকেট থেকে রিসিটখানা চিশতী বের করে নিয়ে তাকে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করেছিলো কাজেই কোন অসুবিধা হলো না।

চিশতী কিছু খাবার এবং খাবার পানি হাসনাবাদ বন্দর থেকে সংগ্রহ করে নিলো। তারপর জাহাজ ছাড়ার জন্য আদেশ দিলো সে।

জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয় বাধ্য হয়ে কাজ করে চললো। ওরা হাসনাবাদ থেকে জাহাজ ভাসালো।

বাঙ্গালী বন্দী যাদের হাসনাবাদ থেকে উঠানো হলো তাদের প্রথমে একটা ক্যাবিনে আটক করে রাখা হলো।

এবার চিশতী নিজে এসে জাহাজ চালককে পথের নির্দেশ দিয়ে বললো—গাদান বন্দরে শাহানশা যাবে না। তুমি আরব সাগর হয়ে জুনাগর অভিমুখে জাহাজ চালনা করো।

জাহাজের চালক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আলী সাহেবের নির্দেশ ছাড়া জাহাজ ছাড়বোনা।

চিশতী হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ আলী সাহেব এখন সাগরের বুকে চিরনিদ্রায় অচেতন। কিংবা হাঙ্গর কুমীরের পেটের মধ্যে গিয়ে তোলপাড় করছে.....

চালক চিৎকার করে উঠলো—চিশতী এ সব তুমি কি বলছো?

হাঁ সত্যি কথা বলছি।

সামরিক অফিসারদ্বয় অবাক হয়ে চিশতীর কথাবার্তা শুনছিলো। তারা তো জানেনা চিশতী কি ভাবে তাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

একটু থেমে আবার বললো চিশতী—শুধু আলী জাফরী নয় এ জাহাজের যে কয়টা শয়তান ছিলো শুধু তোমরা তিনজন ছাড়া সবাইকে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করেছি। তোমরা যদি কথা না শুন তবে তোমাদের অবস্থাও তেমনি হবে।

চালক বলে উঠলো—চিশতী তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে?

চিশতীকে সবার আগেই খতম করেছি.....

তুমি, তুমি কে তবে.....

আমি চিশতীর প্রেত আত্মা। খবরদার কোন রকম চালাকি করতে যেওনা তা হলে তোমাদের অবস্থাও ঐ রকম হবে। চিশতীর কথাগুলো চালক ও সারেংদ্বয়ের মনে ভীতির সঞ্চার করলো। তারা নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য চিশতীর কথামত কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো।

জাহাজ হাসনাবাদ বন্দর ত্যাগ করে গভীর জলের দিকে অগ্রসর হলো।

পথে আর কোন বাধা এলো না। আরব সাগর হয়ে জাহাজ এবার জুনাগড়ের দিকে এগিয়ে চললো।

যে বাঙ্গালী বন্দীদের হাসনাবাদ বন্দর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিলো তাদেরকেও চিশতী মুক্ত করে দিল। মৃত্যুর জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলো কারণ তারা জানে পশ্চিমা শাষক গোষ্ঠি তাদের কিছুতেই মুক্তি দেবেনা। বেশ কিছু দিন হলো তাদের নিজ নিজ বাসা থেকে ধরে এনে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক রেখে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাদের অপরাধ তারা বাঙ্গালী।

আজ মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সবাই।

চিশতী সবাইকে খেতে দিলো।

প্রাণক ভরে খেলো সবাই।

দু'দিন দু'রাত অবিরাম চলার পর জুনাগড় পৌঁছলো জাহাজ শাহান-শা। জুনাগড় বন্দরে পৌঁছানোর পর চিশতী সবাইকে ডেকে বললো—এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে, আপনারা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নিশ্চিন্ত। পাকিস্তানী হানাদারদের নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। এবার আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন।

সবাই চিশতীকে প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। একজন প্রবীন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বললেন—বাবা তোমাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

চিশতী বললো—আপনাদের দোয়া আমার কাম্য। কৃতজ্ঞতা আমি চাইনা।

জাহাজের চালক ও সারেংদ্বয়কে জীবনে না মেরে ক্ষমা করে দিলো চিশতী। তবে একেবারে মুক্তি না দিয়ে জুনাগড় পুলিশের হাতে তুলে দিলো।

চিশতী সামরিক অফিসারদ্বয়কে ধন্যবাদ জানালো কারণ তাদের সাহায্য না পেলে একটু অসুবিধা হতো।

জাহাজ ত্যাগ করে সবাই নেমে গেলো।

ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে চিশতী।

চিশতী এবার ফিরে এলো, একটি ক্যাবিনে প্রবেশ করে পোশাক পাল্টে নিলো। দাড়ি গোঁফ এখন তার মুখে নেই সুন্দর দিব্যি চেহারার এক যুবক।

চিশতী পাল্টে গেলো সম্পূর্ণরূপে।

❑

লাহোর বিমান বন্দরের অদূরে সেই কালোরং-এর নতুন ঝকঝকে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতিক্ষা করছে মালিকের।

যে বিমানটি এখন বিমান বন্দরে অবতরণ করলো সেটা ইরান থেকে আসছে।

বিমানখানা রানওয়ের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এক এক করে বিমান থেকে নেমে এলো যাত্রীগণ। সব শেষে নামলো সেই যুবক ভদ্রলোকটি। চোখে গগল্‌স হাতে এটাচী ব্যাগ।

বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে তারপর বেরিয়ে এলো বিমান বন্দরের বাইরে অদূরে থেমে থাকা গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ড্রাইভারের চোখে মুখে খুশির উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়লো।

যুবক বললো—কি সংবাদ রহমান?

সংবাদ আছে সর্দার। কথার ফাঁকে গাড়ির দরজা খুলে ধরে রহমান।

যুবক অন্য কেহ নয় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশ হয়ে লাহোর এসে হোটেল গুলবাগে উঠেছে সে। ভদ্রলোকের বেশে সন্ধান করে চলেছে পাকিস্তানে কোথায় কি ভাবে বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কোথায় কোন বন্ধী শিবিরে কতজন বাঙ্গালী আটক করে রাখা হয়েছে। কোথায় তাদের কি ভাবে চালান দেওয়া হচ্ছে।

গাড়িতে চেপে বসলো বনহুর।

রহমান ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটলো উল্কা বেগে।

রহমান বললো—সর্দার কাজ সমাধা হয়েছে?

হাঁ হয়েছে। একটা চুরুট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বনহুর।

রহমান ড্রাইভ আসন থেকেই পুনরায় প্রশ্ন করে—আপনি কি চিশতীর বেশে.....

হাঁ আমি আলী জাফরীর বিশ্বস্ত অনুচর চিশতীর বেশেই কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয়েছি রহমান। প্রথম পদক্ষেপেই আমি কৃতকার্য হয়েছি। প্রায় তিন শত বন্দী বাঙ্গালীকে আমি বর্বর পাকিস্তানী দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি।

রহমান বললো—সর্দার কোয়েটা থেকে কায়েস ওয়ারলেসে সংবাদ পাঠিয়েছে নোরাইল, পেশোয়ার, তুখারাম সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সাগাই দুর্গে বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারীদের আটক রেখে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হু।

আপন মনে বনহুর চুরুট থেকে ধুম্র নির্গত করে চললো।

জনবহুল রাজপথ অতিক্রম করে গাড়িখানা ছুটে চলেছে। পথের দু'পাশে সুউচ্চ প্রাসাদ সমতুল্য অট্টালিকা। নানা রকম মূল্যবান জিনিসের চোখ ঝলসানো দোকান পাট। মাঝে মাঝে বড় বড় ফলের দোকান, নানা

রকম ফলের সমারোহ। থরে থরে ফলগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কোথাও কোথাও পথের ধারে ছোট ছোট পার্ক, পার্কে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ তাতে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে। শ্যামল দুর্বাঘাসগুলোও সতেজ সবুজ। শুষ্ক মরুভূমির দেশে যেন স্বর্গ রচনা করেছে ওরা।

পার্কের মধ্যে পাথরাসন এবং ফোয়ারা রয়েছে। কোন কোন পার্কে পাথরের মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটি নারী মূর্তি কোনটি বা শিশুর প্রতিচ্ছবি।

বনহুর আপন মনে তাকিয়েছিলো বাইরের দিকে। মনে মনে গভীর চিন্তার জাল বুনে চলেছে সে।

রহমান তখন ফিরোজ খাঁ রোড অতিক্রম করে গুলবাগ হোটেলের দিকে গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

গুলবাগ হোটেলে গাড়ি থামতেই রহমান ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। বনহুর নেমে পা বাড়ালো সম্মুখের দিকে।

সোজা সে লিফটে চেপে নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলো।

সোফায় গা এলিয়া দিলো বনহুর।

সম্মুখের টেবিলের ফুলদানীতে এক থোকা রজনী গন্ধা গন্ধ ছড়াচ্ছে।

বনহুর চুরুট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলেছে। তার চুরুটের ধূম্র রাশি চার পাশে ঘুর পাক খাচ্ছিলো। পাশের কোন ক্যাবিন থেকে পিয়ানো সুমিষ্ট সুর ভেসে আসছে।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করে চলেছে।

এমন সময় দরজা খুলে গেলো, ক্যাবিনে প্রবেশ করলো সেই তরুণী, যে তরুণী গুলবাগ হোটেলের প্রথম দিন একরাশ ফুল নিয়ে রাত দশটায় তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই তরুণী একটু নত সম্মান দেখালো। আজও তার হাতে একরাশ ফুল, গোলাপ নয় গন্ধরাজ।

তরুণী ফুলের তোড়টা বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো—শুভ প্রভাত।

ধন্যবাদ।

ফুলের তোড়াটা গ্রহণ করলো বনহুর। তারপর রেখেছিলো সামনের টেবিলে।

তরুণী বললো—দেখুন মিঃ লিয়ন আপনি বড্ড নীরস মানুষ।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো—তুমি দেখছি আমার নামটাও জেনে নিয়েছো।

হাঁ হোটেলের নামের লিষ্ট দেখলেই নাম জানা যায়। কত নম্বর ক্যাবিনে কে আছেন বুঝতে কষ্ট হয়না।

বনহুর বললো—নীরস আমি কি করে বুঝলে?

সেদিনও আপনি আমার দেওয়া ফুল হাতে নিয়েই বিছানার পাশে রেখে দিয়েছিলেন, আজও আপনি এতো সুন্দর ফুল তবু নাকে দিয়ে ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন না.....

ও এই কথা?

হাঁ, সত্যি আপনার আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে।

ফুল আমি ভালবাসি কিন্তু ফুলের সুগন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করেনা।

আশ্চর্য মানুষ আপনি।

এ কথা বহু নারীর মুখে আমি শুনেছি।

সেটা স্বাভাবিক কারণ আপনার মোহময় সৌন্দর্য হয়তো অনেক নারীকেই আকৃষ্ট করেছে কিন্তু.....থাক আর বলবোনা।

বলো কি বলতে চাচ্ছিলে?

কিন্তু আপনাকে তারা নাগালের মধ্যে পায়নি।

হয়তো তাই। থাক্ ওসব কথা, বসো।

পাশের চেয়ারে না বসে তরুণী সম্মুখের টেবিলে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো। তার পরনে আজ আট সাট সালোয়ার কামিজ রয়েছে। বক কাটা চুলগুলো এলিয়ে পড়ে আছে কাঁধে ঘাড়ে কপালে। ঠোঁটে পুরু লিপ্‌ষ্টিক। অদ্ভুত দেহ ভঙ্গীমায় দাঁড়ালো তরুণী।

বনহুর নতুন একটা চুরুট বের করে আগুন ধরালো।

তরুণী বললো—আপনি বড্ড বেশি ধূমপান করেন বুঝি?

আমার মনে হয় বড্ড বেশি নয়।

কিছু সময় উভয়েই নীরব।

তরুণী বললো—আপনি কিন্তু এখনও আমার নাম জানতে চাননি?

জানার তেমন কোন আগ্রহ নেই বলেই জানতে চাইনি। তবে যখন প্রয়োজন বোধ করবো জেনে নেবো।

আপনার চেহারার সঙ্গে আপনার আচরণ বা কথা বার্তার কোন মিল নেই দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

চেহারাটা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বের বাইরে আর সবকিছু আমার আয়ত্ত্বের মধ্যে কিনা।

আপনার সঙ্গে কথা বলে কোন.....থামলো তরুণী।

ওর কথা শেষ করলো বনহুর—আনন্দ নেই এইতো?

হাঁ।

বলেছিতো আমি যা প্রয়োজন মনে করি তাই করে যাই। যাক আমি কিন্তু খুব আনন্দ পাচ্ছি তোমার সঙ্গে কথা বলে।

সত্যি!

হাঁ।

এতোক্ষণে আপনার মধ্যে প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে।

না হলে আমাকে বুঝি প্রাণ হীন একটা দেহ মনে করছিলে?

কতকটা তাই।

আচ্ছা.....এবার কিন্তু তোমার নামটা আমার প্রয়োজন হচ্ছে।

আমার নাম মিস শাম্মী.....

হুঁ। আচ্ছা মিস শাম্মী এ হোটেলে তুমি কতদিন আছো?

বেশি নয়—দু'বছর।

গুলবাগ হোটেলের সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

আছে। তবে দু'এক দিনের মধ্যে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে হয়তো.....

পরিচয় হয়নি এইতো?

হাঁ। কিন্তু হঠাৎ আপনি এ প্রশ্ন করলেন কেনো?

তোমার সুন্দরীর সাধক সবাই কিনা তাই.....

শুধু আপনি ছাড়া।

কে বলে আমি তোমার সাধক নই?

আপনার অবহেলা উপেক্ষা আমাকে.....

মিস শাম্মী উপরের আচরণই মানুষের অন্তরের কথা নয়। আসলে আমি তোমাকে উপেক্ষা করি নাই, তোমাকে যাচাই করে নিচ্ছিলাম। কারণ কি জানো?

মিঃ লিয়নের মুখে কথাগুলো শাম্মীর বড় ভাল লাগে বলে শাম্মী—কারণ আমি জানবো কি করে মিঃ লিয়ন।

তবে শুন। তুমি সবার প্রয়োজনে গিয়ে হাজির হও এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তোমাকে তারা বিদায় করে দেয়। হোটেলের অন্যান্য জিনিসের মতই তোমাকে তারা ব্যবহার করে কিন্তু আমি তোমাকে সে ভাবে গ্রহণ করতে চাইনা শাম্মী। আমি তোমাকে,.....

বলুন! বলুন মিঃ লিয়ন? মিস শাম্মী মোহগ্রস্তের মত চোখ দুটো তুলে ধরে মিঃ লিয়নের মুখের দিকে। গভীর আবেগে সরে আসে সে আরও কাছে।

বনহুর হাতের চুরুট এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে দেহটাকে এলিয়ে দেয় সোফায় একটু হেসে বলে—আমি তোমাকে ভালবাসি.....

সত্যি!

হাঁ, ঠিক ফুলের মত.....

ফুল!

হাঁ ফুল যেমন মানুষ ভালবাসে আমি তোমায় তেমনি ভালবেসে ফেলেছি।

আঃ কি মধুর কথা আপনি শুনালেন মিঃ লিয়ন। শাম্মী দু'হাত প্রসারিত করে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরতে যায়।

বনহুর আলগোছে উঠে দাঁড়ায় হেসে বলে—শাম্মী তুমি অপূর্ব.....একটু থেমে বলে—শাম্মী?

বলুন?

তোমাকে এরা কত দেয়?

বিশ হাজার।

মাসে বিশ হাজার পাও?

হাঁ।

কিন্তু তোমার যে রূপ তাতে বিশ হাজার কেনো পঞ্চাশ হাজার তোমার প্রাপ্য। শাম্মী আমি যদি তোমায় পঞ্চাশ হাজার দেই তাহলে.....

আপনার ভালবাসার কাছে পঞ্চাশ হাজার কেনো এক লক্ষ টাকাও কিছুনা। সত্যি বলতে কি আজ পর্যন্ত যত ব্যক্তির সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছে.....

শাম্মীর কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে বনহুর—আমার মত কেউ নয় এইতো?

হাঁ। আপনাকেই আমি প্রথম এক ধৈর্যশীল পুরুষ রূপে দেখেছি।

কেমন?

যার মধ্যে দেখিনি কোন লালসাপূর্ণ মনোভাব। নিজকে বিক্রি করে পয়সা উপার্জনই আমার পেশা। তাই এ হোটেলে আসার পর থেকে সবার মনোতুষ্টিই করে এসেছি। যার পাশে গিয়েছি কেউ আমাকে পরিত্রাণ দেয়নি। সবাই তাদের প্রাপ্য নিয়েছে আদায় করে। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এ হোটেল থেকে পালিয়ে নিজকে বাঁচাতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। নাগপাশের মতই জড়িয়ে পড়েছি এই হোটেলের সঙ্গে যেন আমিও এ হোটেলের একটি অঙ্গ। থামলো শাম্মী, তার মুখমন্ডলে একটা ব্যথা করুন ভাব জেগে উঠলো।

বনহুর ওর কপাল থেকে এলো মেলো চুলগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে বললো—বিচিত্রময় পৃথিবীর বৈচিত্রময় মানুষ। এ পৃথিবী বড় স্বার্থপর তাই সবাই পাবার জন্য ব্যাকুল। এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি লোভ মোহ পরিহার করে চলতে পারবে সেই.....পারে জয়ী হতে।

সত্যি মিঃ লিয়ন আপনি অস্বাভাবিক মানুষ। আমাকে সেদিন গভীর রাতে নিভৃত্বে পেয়েও আপনি আমাকে স্পর্শ করেননি। আপনার ঐ দুটি চোখে দেখতে পাইনি কোন কূৎসিত ইংগিৎ পূর্ণ চাহনী। আপনি মানুষ নন.....

শাম্মী তুমি বড্ড ভাবময় হয়ে পড়েছো। আচ্ছা আজ এসো। তোমার জন্য প্রতিক্ষা করবো।

শাম্মী বেরিয়ে যায়।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে ড্রাইভার বেশী রহমান।

বনহুর দাঁড়িয়েছিলো এবার সে আসন গ্রহণ করে।

রহমান নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পূর্বে তার ক্যাবিন থেকে শাম্মী বেরিয়ে গেলো। রহমানের পাশ কেটেই গেছে সে, তাই রহমান একটু নিজকে বিব্রত বোধ করছিলো।

বনহুর সচ্ছ কণ্ঠে বললো—রহমান সেই তরুণী এসেছিলো।

দেখেছি সর্দার।

ওকে দিয়ে আমাদের কাজে অনেক সাহায্য হবে বলে আমার মনে হচ্ছে—তরুণীর নাম শাম্মী। হাঁ তুমি তখন বলে ছিলে কোয়েটা থেকে কায়েস যে সংবাদ পাঠিয়েছে.....

রহমান একটা মানচিত্র বের করে মেলে ধরলো।

বনহুর এবার মনোযোগ সহকারে মানচিত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

❑

সাগাই দুর্গ।

ভূগর্ভে অন্ধকার ময় একটা বৃহৎ আকার কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের বাংলাদেশের যে সব বীরসন্তান পাকিস্তানে কোয়েটা, নোরাইল, পেশোয়ার, তুখারাম, লাহোর, করাচী প্রভৃতি গ্রেপ্তার করে এখানে আটক করা হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি এই সব সামরিক কর্মচারীদের শুধু আটক করেই ক্ষান্ত হয়নি, এদের উপর চালানো হচ্ছে অকথ্য নির্মম অত্যাচার।

মাঝে মাঝে বন্দী কক্ষ থেকে বন্দীদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয়, সন্ধ্যার পূর্বে যখন আবার এদের ফিরিয়ে আনা হয় তখন এরা মৃতের ন্যায় কাহিল হয়ে পড়ে। সমস্ত শরীরে আঘাতের চিহ্ন। জামা কাপড় ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত।

একেই তো বন্দীরা ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর। সমস্ত দিন তাদের পেট পুরে কোনদিন খেতে দেওয়া হয়না। যা খেতে দেওয়া হয় তা যৎ সামান্য মাত্র। কোনদিন সচ্ছ পানিও পান করতে দেয়না ওদের গন্ধ যুক্ত পানি দেওয়া হয় তাও অতি অল্প।

সাগাই দুর্গে। সামরিক কর্মচারীগণকে আটক রেখে সাজা দেওয়া হচ্ছে। এখানে সাধারণ বাঙ্গালীদের রাখা হয়নি। তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন বন্দী শিবির।

জল্লাদ ইয়াহিয়ার মুখে চুন কালি মাখিয়ে তাকে গদি থেকে নামিয়ে শিয়ালের মত ধূর্ত লারাকানের নবাব জাদা ভুট্টো সাহেব গদিতে বসে সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে চলেছেন। তার কর্মচারীদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাঙ্গালীদের উপর আমরা যাই করিনা কেনো অতি গোপনে করতে হবে, একথা যেন বাইরের রাষ্ট্র-টের না পায়।

নবাব জাদার সতর্কবাণী উপেক্ষা করার সাধ্য কার। তাই ইচ্ছা থাকলেও প্রকাশ্যে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ চালানো সম্ভব হচ্ছেনা। যতদূর গোপনতা রক্ষা করেই কাজ করে চলেছে পশ্চিমা মহাত্মনগণ।

সামরিক অফিসার ও কর্মচারীদের যে শাস্তি দেওয়া হয় তা কল্পনাতীত। প্রথমে তাদের কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অবশ্য সেটাই উপলক্ষ মাত্র, অত্যাচারের পূর্বে কিছু একটা সূত্র প্রয়োজন না হলে অযথা মারপিট করাটা কেমন যেন বেখাপ্পা দেখায়। প্রথমে চলে রোলার আঘাত, তারপর চলে অগ্নিদগ্ধ লৌহ শলাকা দ্বারা দেহের বিভিন্ন স্থানে সেক, তারপর ইলেকট্রিক চার্জ। নানাভাবে অত্যাচার চালানোর পর বন্দীদের পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় বন্দী শিবিরে।

সাগাই দুর্গ।

গভীর রাত।

সাগাই দূর্গের একটি নিভৃত কক্ষে সমস্ত সামরিক কর্মচারীদের জড়ো করা হয়েছে, তাদের বলা হয়েছে তোমাদের আজ নতুন আর একটি ভাল শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে।

বন্দীগণ ভাবছে সত্যি বুঝি তাদের ভাল কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে একটু মুক্ত বাতাস পাবে। তাই তাদের মুখোভাব প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

দুর্গের অপর এক জায়গায় কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গোপনে আলাপ আলোচনা করছে। এক ব্যক্তি বললো—মোটরের দরজা বন্ধ থাকবে। যখন মোটর খানা রাভী নদী অতিক্রম করার জন্য ব্রিজের উপর উঠবে ব্যাস গাড়ির মধ্যে গ্যাস ছাড়বে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে সবাই। তারপর গাড়ি থেকে সবাইকে রাঙী নদী বক্ষে নিক্ষেপ করবে।

বিরাট বপু ওয়ালা ড্রাইভার মাথা দোলালো, সে ঠিক্ বুঝতে পেরেছে।

ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে তার সহকারী।

এবার ড্রাইভার সহকারীকে লক্ষ্য করে বললো—কত জন বন্দী আছে?

সহকারী জবাব দিলো—প্রায় দু'শজন।

সবাই এরা সামরিক বাহিনীর লোক?

এবার জবাব দিলো প্রথম ব্যক্তি—হাঁ বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী।

ড্রাইভার বললো আবার—এক সঙ্গে সবাইকে তো নিয়ে যাওয়া যাচ্ছেনা মালিক?

কতজন তোমার বাড়িতে ধরবে? বললো সেই প্রথম ব্যক্তি। এই লোকটি এখানকার কর্মকর্তা বলে মনে হচ্ছে।

ড্রাইভার জবাব দিলো—পঞ্চাশ জন ধরবে।

আচ্ছা পঞ্চাশ জনকেই আজ সরিয়ে ফেলো তারপর কাল আবার পঞ্চাশ জনকে বুঝলে.....

ড্রাইভার পান চিবুচ্ছিলো, এবার ঠোঁটের ফাঁকে আংগুল প্রবেশ করিয়ে চিবুনো পানের অংশগুলো বের করে পুনরায় চিবুতে চিবুতে বলে—বুঝেছি মালিক।

তাহলে যাও কাজ শুরু করো। তাদের লোকদের লক্ষ্য করে বললো মালিক—যাও তোমরা বন্দীদের গাড়িতে তুলে দাও।

ড্রাইভার গাড়ির দিকে এগুলো।

সহকারী বললো—ওস্তাদ আমি কয়েকটা পান নিয়ে আসি।

পান লাগবেনা আমার কাছে প্রচুর পান আছে। তুমি এসো.....

চলুন ওস্তাদ।

সহকারী ওস্তাদের পিছনে এগিয়ে চললো।

তখন গাড়িতে বাঙ্গালী কর্মচারীদের উঠানো হচ্ছে। গুণে গুণে পঞ্চাশ জনকে তুলে দেওয়া হলো। অন্ধকার রাত চারিদিকে থম থম করছে।

ড্রাইভার আর একখিলি পান মুখে গুঁজে গাড়িতে উঠে বসলো। সহকারীকে বললো—তুমি হুঁসিয়ার থাকবে রাঙ্গী নদীর নিকটে পৌঁছবার পূর্বেই গ্যাস পাম্পের সুইস টিপে দেবে তারপর ব্রিজের উপর এসে.....

থাক আর বলতে হবেনা আমি সব জেনে নিয়েছি ওস্তাদ।

ড্রাইভারের পাশের আসনে উঠে বসলো তার সহকারী নিজামী। গাড়িতে চড়ে বসবার পূর্বে গাড়ির দরজা ভালভাবে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়ে এলো সে।

গাড়ি এবার ছুটতে শুরু করলো।

জনহীন রাজ পথ।

মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। দোকানগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে। লাইট পোষ্টগুলো নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোন হোটেল থেকে তখনও কাঁটা চামচের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গাড়িখানা জাহাঙ্গীর রোড ছেড়ে ফিরোজ পুর রোড ধরে রাঙী নদীর দিকে অগ্রসর হলো। অদূরে একটা মোড়ের দোকান থেকে হৈচৈ শোনা যাচ্ছে।

ড্রাইভার স্পীডে গাড়ি চাপিয়ে চলেছে।

সহকারী তার দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে হাই তুলে বললো—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ড্রাইভার ধমক দিয়ে উঠে—রেখে দাও তোমার ঘুম। সজাগ হয়ে বসো। আমরা প্রায় এসে গেছি মাত্র কয়েক মাইল দূরেই রাঙী নদীর হাব্‌সী ব্রিজ।

ও তাই নাকি, আমার কিন্তু খেয়াল নেই।

সব মনে আছে তো?

আছে ব্রিজের নিকটবর্তী হলেই গ্যাস পাইপের সুইচ টিপে দেবো। বাস সব খতম হয়ে যাবে তারপর.....সব মনে আছে ওস্তাদ, সব মনে আছে।

আবার নীরব।

গাড়িখানা উল্কা বেগে ছুটে চলেছে।

এখন দু'পাশে কোন বাড়িঘর বা দালান কোঠা নাই। পথের দু'ধারে বিস্তৃত প্রান্তর। সো সো করে বাতাস বইছে। একটা রী-রী শব্দ হচ্ছে হাওয়ার মধ্যে।

রাঙী নদী অতি নিকটে এসে পড়েছে, তাই হাওয়া এতো ঠান্ডা।

গাড়ির ভিতরে বন্দীরা মাল বোঝাই বস্তার মত এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। ভিতরটা জমাট অন্ধকার তারপর গরমে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে সবার। তবু একটা ক্ষীণ আশা হয়তো বা তাদের মধ্যে উকি দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা তারা একটু মুক্ত বাতাসের জন্য প্রতিক্ষা করছে। ওরা জানেনা তাদেরকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে অনেকেরই সন্দেহ জেগেছে হয়তোবা এ যাত্রাই তাদের জীবনে শেষ যাত্রা। কোনদিন হয়তো তারা আর আলোর মুখ দেখতে পাবেনা। যদিও মনে সন্দেহ জেগেছিলো তবু বিনা আপত্তিতে গাড়িতে উঠেছিলো, কারণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে তারা অনেক আগেই। এখানে থাকলেও মরতে হবে সেখানেও মরতে হবে। পশ্চিমা পশুরা তাদের মুক্তি দেবেনা। এরা যদি মুক্তি পায় তা হলে পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের অবস্থা

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজেই গাড়ির খোলসে যে সব সামরিক কর্মচারী বন্দী ছিলেন তারা নিরাশার অন্ধকারে হাবু ডুবু খাচ্ছিলেন।

এবার হাব্‌সী ব্রিজ দৃষ্টিগোচর হলো।

ব্রিজটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিট তাহলেই ব্রিজের উপর গাড়িখানা পৌঁছে যাবে।

গাড়ির স্পীড আরও বেড়ে গেছে।

ড্রাইভার বললো—নিজামী বিষাক্ত গ্যাস এর সুইচ টিপে দাও.....

কথা শেষ হয়না, পাঁজরে একটা শক্ত ঠান্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করে ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গে নিজামীর কণ্ঠ স্বর, গাড়ি রুখো।

ড্রাইভার ফিরে তাকাতেই বলে নিজামী—এই মুহূর্তে গুলি করে হত্যা করবো তোমাকে। গাড়ি রুখো বলছি।

ড্রাইভার নিজামীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছিলো, এবার সে গাড়ি রুখতে বাধ্য হয়। হাবসী ব্রিজের অনতি দূরে গাড়ি থেমে পড়ে।

নিজামী তখনও ড্রাইভারের বুকে রিভলভার চেপে ধরে রেখেছে, বললো—একচুল নড়লে গুলি ছুড়বো। গাড়ি থেকে নেমে পড়ো বাছাধন।

ড্রাইভার একটা কথা উচ্চারণ করবার সাহসী হলোনা। বাধ্য হলো সে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। নিজামী তখনও কিন্তু রিভলভার সরিয়ে নেয়নাই, বললো—এসো আমার সঙ্গে।

গাড়ির পিছনে এনে বললো নিজামী—শীঘ্র চাবি বের করে তালা খুলে ফেলো।

ড্রাইভার চাবি নিয়ে তালা খুলে দেয়, একটি কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়না। নিজামী যে আসল নিজামী নয় সে ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে। কথা বললেই যে ওর হাতের রিভলভার গর্জে উঠবে তাতে কোন ভুল নাই। তাই ড্রাইভার কোন রকম প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়না।

তালা খুলে দিতেই একটা ঠান্ডা মুক্ত বাতাস বন্ধ গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। বন্দীগণ গুদামজাত অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলো তারা নিশ্বাস নিলো।

বললো নিজামী—আপনারা নেমে আসুন গাড়ি থেকে।

বন্দীগণ হতভম্ব হয়ে গেছে, যদিও জায়গাটায় কোন আলো ছিলোনা তবু অদূরস্থ লাইট পোষ্টের আলোতে সব তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে ড্রাইভারের পিঠে তার সরকারী রিভলভার চেপে ধরে আছে।

ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় বুঝতে পারেন বন্দীগণ। তারা নেমে পড়ে গাড়ির খোলসের মধ্য থেকে।

এবার নিজামী ড্রাইভারকে বলে—যাও ভিতরে উঠে পড়ো।

ড্রাইভার বলে উঠলো—নিজামী তুমি বিশ্বাস ঘাতক.....

কে নিজামী.....আমি তোমার যমদূত.....কথাটা বলে নিজামী তার দাড়ি গোঁফ খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার চমকে উঠলো।

বন্দী সামরিক অফিসারগণ দেখলো সুন্দর বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক। কেউ কোন কথা বলতে পারছেনা, সব যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে।

রিভলভারধারী ভদ্রলোক স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বনহুর বজ্র কঠিন কণ্ঠে বললো—ড্রাইভার তুমি যে ভাবে এদের হত্যা করবে মনস্থ করেছিলে আমি তোমাকে সেই ভাবে হত্যা করবো। বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে মরতে কেমন অনুভব করো।

বনহুর কঠিন হাতে ড্রাইভারের জামার কলার চেপে ধরে টেনে গাড়ির খোলের মধ্যে তুলে দরজা বন্ধ করে দিলো তারপর ড্রাইভ আসনে বসে গ্যাস পাইপের সুইচ টিপে ধরলো। পরক্ষণেই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। একটু বিলম্ব করে খুলে ফেললো গাড়ির দরজা তারপর টেনে বের করে আনলো ড্রাইভারের প্রাণহীন দেহটা। ফেলেদিলো রাঙী নদীর বুকে।

বাঙ্গালী বন্দী অফিসারগণ অবাক হয়ে বনহুরের কার্য কলাপ দেখছে তারা ভেবে পাচ্ছেনা কি ঘটলো বা কি ঘটছে। ড্রাইভারের মৃতদেহটা রাঙী নদীতে নিক্ষেপ করার পর পুনরায় বনহুর ফিরে এলো সামরিক অফিসারদের সম্মুখে, ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বললো সে তাদের কাছে।

সবশুনে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো সামরিক অফিসারদের মন!

বনহুর কিন্তু তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর সময় না দিয়েই বললো—আপনাদের জন্য আমি কয়েক খানা জেলে নৌকার বন্দোবস্ত করেছি। আপনারা সেই নৌকার মাঝি সেজে পাকিস্তান থেকে সড়ে পড়ুন। সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে আপনারাই সেই সামরিক কর্মচারী বা অফিসার। আপনাদের আরও অনেকে এখনও পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির বন্দী শিবিরে আটক আছে তাদের মুক্তির জন্য আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবো। চলুন আমার সঙ্গে.....

বনহুর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে রাঙী নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো। আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ যে নৌকাগুলো দেখছেন ও গুলো আপনাদের জন্য.....হাতে তালি দেয় বনহুর একবার দু'বার তিন বার।

অল্পক্ষণেই দু'জন লোক এসে দাঁড়ায়।

বনহুর বললেন—কায়েস, এদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। আরও বহু বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী এখনও সাগাই দূর্গে আটক আছে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। তোমরা এদের জন্য জেলেদের পোশাক এনেছো?

এবার জবাব দিল কাওসার—হাঁ আপনার কথা মতই আমরা জেলে নৌকায় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছি।

খাবার নিয়েছো?

হাঁ প্রচুর চিড়া এবং গুড় সংগ্রহ করে নিয়েছি।

বনহুর ফিরে তাকালো অন্ধকারে সামরিক অফিসারদের দিকে তারপর বললো—বন্ধু এবং আমার ভাইরা এবার আপনারা বিদায় গ্রহণ করুন। খোদা আপনাদের সহায়.....

সামরিক অফিসারগণ বনহুরকে এক এক করে আলিঙ্গন করলো, সবার চোখেই পানি। বললো ওরা—জানিনা কে আপনি? এ বিপদ মুহূর্তে আপনার অসীম দয়া আমাদের জীবন রক্ষা করলো.....

কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের কথা বলার বা শোনার সময় ছিলোনা। সবাইকে জেলে নৌকায় উঠার জন্য বলে বনহুর। বনহুরের আদেশে সবাই অগ্রসর হয়।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তখন হাউ-মাউ করে কেঁদে চলেছে।

বনহুর তাকে জেলে নৌকায় যাবার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু বৃদ্ধা ভদ্রলোক যাবেন না বলে জেদ ধরলেন।

বনহুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে আপনার বলুন?

বৃদ্ধ কেঁদে কেঁদে বললো—আমার সবই গেছে আমি বেঁচে থেকে কি হবে। পশ্চিমারা আমার দু'ছেলেকে মেরে ফেলেছে, আমার স্ত্রীকে ওরা হত্যা করেছে। আমার একমাত্র মেয়ে নাসিমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। জানিনা নাসিমা মা আমার কোথায়। কেমন আছে সে.....

বনহুর বৃদ্ধের কথায় অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করলো কিন্তু সময় আর বেশি নেই, রাতের অন্ধকারেই তাদের নৌকা রাঙী নদী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

কায়েস কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়—বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের নৌকা ছাড়তে হবে।

বৃদ্ধ তখনও বেকে বসে আছে, তিনি উন্মাদের মত বলছেন—মা নাসিমাকে ছেড়ে আমি পালিয়ে যেতে পারবোনা। আমাকে এখানে থাকতে দাও.....না না যাবোনা আমি যাবোনা.....

বনহুর কি করবে ভেবে পায়না, বৃদ্ধের করুন কথা গুলো তার হৃদপিন্ড ছিড়ে ফেলছিলো। বললো—আমি কথা দিছি আপনার মেয়ে নাসিমাকে আমি খুঁজে বের করবো। সত্যি সত্যি বলছো বাবা? বৃদ্ধের কণ্ঠে ব্যাকুল উচ্ছসিত ভাব।

বনহুর চুপ করে থাকতে পারেনা, সে পুনরায় বলে—সত্যি! বলছি।

আমাকে স্পর্শ করে বলো আমার মাকে তুমি খুঁজে বের করবে? উদ্ধার করবে ঐ জল্লাদের কবল থেকে তাকে.....

হাঁ আপনাকে স্পর্শ করে বলছি করবো। আপনি যান বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছি—যাচ্ছি.....পারবে জানিঃ তুমি পারবে মা-মা নাসিমাকে উদ্ধার করতে.....কায়েস ততক্ষণে বৃদ্ধের হাত ধরে এক রকম প্রায় টেনে নিয়ে চলে যায়।

সবগুলি অফিসার ততক্ষণে নৌকায় উঠে বসে ভীত কম্পিত হস্তে পোশাক পাল্টে নিচ্ছে। পেটে ক্ষুধা, দেহে পশ্চিমাদের নির্যাতনের নির্মম আঘাতের চিহ্ন। তবু বাঁচার আশায় সবাই যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

কায়েস আর কাওসার এদের নিয়ে নৌকায় চেপে বসেছে। অল্পক্ষণেই নৌকাগুলো তীর ত্যাগ করে গভীর পানির দিকে ভেসে চললো।

বনহুর কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো নৌকাগুলোর দিকে। ঝাপসা অস্পষ্ট লাগছে নৌকাগুলো। বারবার বনহুরের কানের কাছে প্রতিধ্বনি হচ্ছে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর, আমাকে স্পর্শ করে বলো আমার মাকে তুমি খুঁজে বের করবে? উদ্ধার করবে ঐ জল্লাদের কবল থেকে তাকে.....

কিন্তু কোথায় সেই নাসিমা যাকে পশ্চিমারা ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে, কেমন করে তাকে সে খুঁজে বের করবে। কে বা কারা তাকে নিয়ে গেছে তাই বা কেমন করে জানবে।

বনহুর বিষণ্ন মনে ফিরে আসে, একটু পূর্বে বন্দীদের মুক্ত করতে পেরে তার যে আনন্দ হয়েছিলো সে আনন্দ যেন নিমিশে মুছে যায়। দ্রুতগতিতে এসে দাঁড়ায় বনহুর গাড়ির পাশে।

গাড়ির ড্রাইভিং আসনে উঠে বসতে যাবে এমন সময় হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে একটা আর্তচিৎকার। কোনো মা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে চলেছেন—কে আছো, আমার বাছাকে বাঁচাও.....আমার বাছাকে বাঁচাও.....

বনহুর কান পেতে শুনলো কোন্‌দিক থেকে শব্দটা আসছে। বুঝতে পারলো ঠিক নদীর তীরের দিক থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটলো। যদিও পথের লাইট পোষ্টের আলোতে তেমন বেশিদূর দেখা যাচ্ছিলো না তবু বনহুর দ্রুত ব্রিজের নিচে নদী তীরের দিকে এগিয়ে চললো। থেমে থেমে সেই কাতর চিৎকার ভেসে আসছে, কোনো বৃদ্ধার গলা ভাঙ্গা করুণকণ্ঠস্বর।

বনহুর ব্রিজের নিচে এসে পড়তেই দেখলো দু'জন লোক একটি লোককে মাটিতে শুইয়ে জবাই করতে যাচ্ছে। তাদের হাতের ছোরাখানা অন্ধকারে চক্‌চক্ করে উঠলো।

একটি মহিলাকে ধরে আছে একজন লোক। সেই বৃদ্ধা মহিলাই চিৎকার করে চলেছেন—বাঁচাও, আমার বাছাকে বাঁচাও.....কে কোথায় আছো, আমার বাছাকে বাঁচাও.....

বনহুর একবার থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নেয়, তারপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে লোক দুটিকে, যারা ছোরা নিয়ে একজনকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর ওদের পিছন থেকে জামার কাঁধের অংশ ধরে টেনে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ঘুষি লাগিয়ে দেয় নাকের উপর।

ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায় একজন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোরা হাতে রুখে দাঁড়ায় আক্রমণ করে সে বনহুরকে।

বনহুর প্রথম ব্যক্তিকে ধরাশয়ী করে দ্বিতীয় ব্যক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ওর ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে প্যাঁচ মেরে ফেলে দেয় ওকে মাটিতে।

ততক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূ'শয্যা ত্যাগ করে পুনরায় আক্রমণ চালায়।

বনহুর ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীগর্ভে। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খেতে থাকে লোকটা। এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোরাসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের উপর।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লোকটাকে ধরে ফেলে, তারপর ওর হাতখানা মোচড় দিয়ে ছোরাটা কেড়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে বসিয়ে দেয় সজোরে।

নিস্তব্ধ নদীতীরে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে উঠে। লোকটা পেট চেপে ধরে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। লোক দু'জন অবাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার বনহুর হাতের ধুলো ঝেড়ে সরে আসে যে লোকটিকে ওরা দু'জন হত্যা করার জন্য চেষ্টা নিয়েছিলো তার পাশে। বৃদ্ধাও তার সন্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এতোক্ষণ তারা অবাক হয়ে দেখছিলো—কে এই মহান ব্যক্তি যে এসে পড়ায় তারা রক্ষা পেলো!

বনহুর এসে জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা কে এবং কি করে এই শয়তানদের কবলে পড়েছেন?

বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে বলতে গেলেন কিন্তু মাকে চুপ থাকতে বলে সন্তান বলতে লাগলো—আমরা বাংলাদেশের মানুষ। বাঙ্গালী আমরা, তাই আমাদের উপর পশ্চিমারা নানারকম নির্যাতন চালিয়ে চলেছে। আমার মা ও আমি নৌকাযোগে পালাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শয়তান পশ্চিমারা টের পায় এবং আমরা নৌকায় উঠবার আগেই আমাদের ধরে ফেলে। আমাকে ওরা ছোরা দিয়ে জবাই করতে যাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে আপনি.....

আপনি কি পাকিস্তানে চাকরি করতেন?

হাঁ, পি আই এতে কাজ করতাম। আমি একজন পাইলট।

ও।

আমাদের প্রায় সাতশ পাইলটকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী আটক করেছে। আমি কোনোক্রমে পালাতে সক্ষম হয়েছি।

এবার বৃদ্ধা বলে উঠেন—বাবা, তুমি কে জানি না, কিন্তু তুমি আমার আর এক সন্তান। তুমি আমার ছেলের প্রাণরক্ষা করলে। দোয়া করি আল্লা তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ করবেন।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার স্নেহময়ী জননীর মুখখানা। বলে উঠলো বনহুর—মা, আপনার দোয়া আমার জীবনের পাথেয়। আচ্ছা ভাই, আপনাদের জন্য কি করতে পারি বলুন?

আর কিছু করতে হবে না, ঐ যে নৌকা দেখছেন ওটা আমাদের নৌকা। মাঝি দু'জন কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, এবার তারা এসে পড়বে তাহলে আমরা পালাতে সক্ষম হবো।

বেশ, তাই করুন। আপনার নৌকায় গিয়ে বসুন। মাঝিরা এসে পড়লে নৌকা ছাড়বেন। চলি.....

নির্বাক নয়নে মা ও সন্তান তাকিয়ে রইলো।

বনহুর অন্ধকারে মিশে গেলো, আর ওকে দেখতে পেলো না তারা।

❑

বনহুর তার ক্যাবিনে শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ধূমপান করে চলেছে। রাশি রাশি ধুঁয়ো কক্ষমধ্যে ঘুরপাক খেয়ে একসময় মিশে যাচ্ছে। বনহুরের মনেও তেমনি কোন রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো, আবার মিশে যাচ্ছিলো মনের আকাশে। সব চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করে বার বার সেই কথাটা মনের গহনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো, সেই বৃদ্ধ সামরিক অফিসারের শেষ কথা.....আমাকে স্পর্শ করে বলো, আমার মাকে তুমি খুঁজে বের করবে? উদ্ধার করবে ঐ জল্লাদের কবল থেকে তাকে.....নিজের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠে বনহুরের কানে.....হাঁ, আপনাকে স্পর্শ করে বলছি করবো.....হাঁ, আপনাকে স্পর্শ করে বলছি করবো.....

কিন্তু কোথায়—কোথায় তাকে খুঁজবো আমি। কেন, কেন তাঁকে স্পর্শ করে শপথ করেছিলাম? তখন এমন করে তলিয়ে ভাবিনি—খেয়ালের বশে বলেছিলাম.....হাঁ, আপনাকে স্পর্শ করে বলছি তাকে খুঁজে বের করবো.....এও কি সম্ভব...এতোবড় এই পাকিস্তানের কোথায় রয়েছে সেই নাসিমা.....

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর—সর্দার!

চমকে উঠে বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বলে—কে, রহমান?

হাঁ সর্দার।

কি সংবাদ?

কায়েস আর কাওসার ফিরে এসেছে।

অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো বনহুর, সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে রহমানের মুখের দিকে—কায়েস আর কাওসার ফিরে এসেছে?

হাঁ সর্দার।

নৌকাগুলো তাহলে ঠিকভাবে নিরাপদেই পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো?

হাঁ, নিরাপদেই নৌকাগুলো পেরিয়ে গিয়েছিলো।

যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। এতোগুলো বাঙ্গালীকে এক সঙ্গে পাঠিয়ে আমি বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। নৌকাগুলো ফিরে এসেছে আবার?

হাঁ সর্দার, সবগুলো নৌকা ফিরে এসেছে।

মাঝিদের প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছো?

দিয়েছি।

বেশ করেছো। একটু ভেবে পুনরায় বললো বনহুর—রহমান, সাগাই দূর্গে এখনও বহু বাঙ্গালী সামরিক অফিসার আটক আছেন। তাঁদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা কল্পনাতীত। ভাবছি কি করে এঁদের উদ্ধার করা যায়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো আবার বনহুর—বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের নিয়ে অত্যন্ত ভাবছেন। কিভাবে এদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া যায় এ নিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টাও চালাচ্ছেন। কিন্তু কবে যে পাকিস্তানী বাঙ্গালীরা তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন, কবে যে তাঁরা এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ততদিনে পাকিস্তানী পশ্চিমা নরপশুরা কত বাঙ্গালীকে যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবে বলা যায় না।

সে কথা মিথ্যা নয় সর্দার। রামসিং শিয়ালকোট থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে সেখানে কয়েকটি বন্দীশিবিরে বাঙ্গালী নারী-পুরুষদের আটক রেখে তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক বাঙ্গালীকে হত্যাও করা হচ্ছে।

রহমান, বাংলাদেশে থাকাকালেই আমি তোমাদের সবাইকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা বিদেশ হয়ে পাকিস্তানে এসে কাজ শুরু করেছো। তোমাদের সহায়তা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছে। নাহলে আমার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হতো না। তোমাদের আরও বেশি পরিশ্রম

করতে হবে। রহমান, আজই আমি শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো। রামসিংকে জানিয়ে দাও সে যেন প্রস্তুত থাকে।

আচ্ছা সর্দার।

আর কোনো সংবাদ আছে?

আজ নতুন আর কোনো সংবাদ নেই।

রহমান!

বলুন সর্দার?

কান্দাই থেকে বেশ কিছুদিন হলো এসেছি। কান্দাই-এর সংবাদ জানার জন্য আমি উন্মুখ আছি। না জানি সেখানে কে কেমন আছে। আহসান কোথায় আছে এবং সে কি কাজ করছে?

আহসান এখন সিন্ধু এলাকায় কাজ করছে।

তাহলে হারুনকে ডেকে পাঠাও। সে হায়দারাবাদে আছে—তাকে বোম্বে হয়ে কান্দাই যেতে বলো এবং নিজে গিয়ে সর্বসংবাদ নিয়ে আসবে। বিশেষ করে মা কেমন আছেন, তিনি বুড়ো হয়েছেন, কাজেই তাঁর জন্য মনটা বড় অস্থির লাগে সময় সময়। কখন কি হয় তা কে জানে! রহমান, বড় হতভাগ্য সন্তান আমি, তাঁর কোনো সেবা যত্ন করতে পারলাম না.....

রহমান বললো—সর্দার, আপনি দেশ ও দশের কাজের মধ্য দিয়েই তো মায়ের সেবা করে যাচ্ছেন।

তাতে মন শান্তি পায় না রহমান। মা বলেছিলেন, তুই সংসারী হয়ে আমার পাশে থাকবি, আমি বড় শান্তি পাবো কিন্তু তাঁকে শান্তি দিতে পারিনি, কাজেই আমিও শান্তি পাবো না এতে আর আশ্চর্য কি আছে। যাক্, তুমি হারুনকে কান্দাই পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা সর্দার।

আর শোন, আজই আমি শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে চাই। ওয়্যারলেসে রামসিংকে সংবাদটা জানিয়ে দিও।

আচ্ছা সর্দার জানিয়ে দেবো।

এখন যাও তাহলে।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

রহমানের শরীরে ড্রাইভারের ড্রেস। এ হোটেলে তাকে সবাই মিঃ লিয়নের ড্রাইভার বলেই জানে।

বনহুর আবার শয্যায় গা এলিয়ে দেয়। নতুন একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে। আবার ডুবে যায় সে চিন্তা সাগরে। কয়েকদিন আগের সেই বৃদ্ধার কথাগুলো কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়,.....বাবা তুমি আমার

সন্তানকে রক্ষা করলে, খোদা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন.....সত্যি কি তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে? পাকিস্তানের বন্দী বাঙ্গালীদের উদ্ধার করতে সক্ষম হবে সে? এখন তার মনে তো অন্য কোনো কামনা নেই, শুধু বাঙ্গালী অসহায় বেচারীদের উদ্ধার চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। বাংলাদেশ সরকার যথাসাধ্য; চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু এদিকে এরা নরপিশাচের দল ততদিনে বাঙ্গালীদের উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে তাতে বাঙ্গালীদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অসহনীয়। এক একটা মুহূর্ত বাঙ্গালীদের কাটছে এক একটা যুগের মত।

হঠাৎ একটা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—আসতে পারি কি?

এসো—এসো.....বনহুর বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে শাম্মী। অপূর্ব দেহ ভঙ্গীমায় এসে দাঁড়ায় সে, মিষ্টকণ্ঠে বলে—কেমন আছেন মিঃ রিয়ন?

বনহুর ছোট্ট করে জবাব দেয়—ভালো।

হাসে শাম্মী—কই, আমি কেমন আছি তাতো জিজ্ঞাসা করলেন না?

তুমি যে ভাল আছো দেখতেই পাচ্ছি।

বসতে পারি কি?

বসো শাম্মী। একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয় বনহুর।

ওখানে নয়, আপনার পাশে বসবো যদি অনুমতি দেন।

বসো—বসো। যদি সুখী হও আমার পাশে বসো।

আপনি তো কোনোদিন ডাকবেন না, তাই আমি নিজে গায়ে পড়ে আসি। বিশ্বাস করুন, এ হোটেলে বহু ধনকুবের আছে যারা আমাকে পাশে পাবার জন্য প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করছে।

জানি, তাছাড়া আমি তো আর ধনকুবের নই শাম্মী ।

আমি তো বলছি—আপনার ভালবাসা পেলে আমি লাখ টাকাও উপেক্ষা করতে পারি।

সত্যি শাম্মী, আমি নিজকে ভাগ্যবান মনে করছি।

সব সময় আপনার হেঁয়ালি পূর্ণ কথা।

তার মানে?

মানে আপনার কথাগুলো.....

বড্ড নীরস, এই তো?

মোটেই না। যাক ওসব কথা, জানেন আজ আমি কেন এসেছি?

বলেছি তো আমার সৌভাগ্য।

হাঁ, সৌভাগ্যই বটে। শাম্মী ভ্যানিটিব্যাগ খুলে একটা গোলাপী রঙের কার্ড বের করে বনহুরের হাতে দিলো।

বনহুর কার্ডখানার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হেসে বললো —হোটেলের তেরো তলার এক নম্বর ক্যাবিনে আজ পার্টি আছে। আমাকে সেখানে যেতে হবে। তুমি নাচবে শাম্মী.....

হাঁ।

তুমি নাচতেও জানো, সত্যি আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

আপনি পার্টিতে যোগ দিলে আমার নাচ সার্থক হবে।

বেশ, যাবো।

এখন তাহলে চলি?

এতো শীঘ্র চলে যাবে শাম্মী?

এই হোটেলে সবাইকে কার্ড বিলি করার দায়িত্ব আমার উপরেই পড়েছে।

আচ্ছা এসো।

শাম্মী হাত তুলে বললো—বাই-বাই—

বনহুর পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। আজ তাহলে শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যাচ্ছে না। তাকে এ পার্টিতে থাকতেই হবে। বনহুর তার হাতঘড়িটার পিছনে ছোট চাবিটায় চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির ঢাকনা খুলে গেলো। বনহুর চাপাস্বরে বললো—রহমান, আজ শিয়ালকোট রওয়ানা দেবো ভেবেছিলাম কিন্তু হবে না, তুমি রামসিংকে সংবাদ দিয়ে দাও কবে যাবো পরে জানাবো.....

ঐ মুহূর্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করে এক ভদ্রলোক।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে জামাটা টেনে হাতের উপর ঘড়িটা ঢেকে ফেলে। হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তার ক্যাবিনে প্রবেশ করতে দেখে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয় বনহুর। তবু মুখে প্রসন্নতা টেনে বলে—আপনি.....

লোকটা হাসলো, কেমন যেন ক্রুর হাসি বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। লোকটা যে পশ্চিম পাকিস্তানী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটা উর্দূতে বললো—আপনি দেখছি সুন্দর বাংলা বলতে পারেন?

বনহুর এ হোটেলে বিদেশী বেশে উঠেছে। সে সব সময় উর্দূ এবং ইংরেজি ভাষায় কথাবার্তা বলে। পোশাক পরিচ্ছদেও তার বিদেশীভাব রয়েছে। সে যে বাংলায় কথা বলে, এটা এ হোটেলের কেউ জানে না।

বনহুর লোকটার কথায় একটু হেসে বললো—আমি সব ভাষাই জানি কিনা, তাই.....

ও বেশ বেশ!

বসুন।

হাঁ, বসবো বলেই এসেছি। আমি আপনার ঠিক পাশের রুমেই আছি। একা একা ভালো লাগে না তাই এলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে।

খুব খুশি হলাম।

লোকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

বনহুর তার চুরুটের টিনটা খুলে ধরলো—নিন।

লোকটা সচ্ছন্দে টিন থেকে একটা চুরুট তুলে নিলো। বনহুর নিজের চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে লোকটার চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলো।

বললো লোকটা—ক'দিন আপনাকে দেখিনি, কোথায় গিয়েছিলেন?

ছোট্ট জবাব দেয় বনহুর—কাজে।

কাজ! কি কাজ করেন আপনি? যদিও প্রশ্নটা করা আমার উচিত নয় তবু জানার বাসনা জাগছে।

বনহুর একমুখ ধুঁয়ো সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—ব্যবসা করি।

ও—একটা শব্দ করলো লোকটা। তার মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো, চুরুটে খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বললো—আমি এসে পড়ায় আপনি কি বিরক্ত বোধ করছেন?

মোটেই না।

তাহলে মাঝে মাঝে আসবো।

খুশি হবো।

আচ্ছা, এবার বলুন তো আপনার নামটা কি?

দরজায় আমার নেমপ্লেটে নজর ফেললেই দেখতে পাবেন।

মাফ করবেন বড্ড ভুল হয়েছে। আমি কিন্তু আপনার নামটা দেখেছি কিন্তু খেয়াল নেই.....

লিয়ন আমার নাম।

তাহলে আমার নামটা বলি?

না বললেও ক্ষতি নেই, এক সময় কষ্ট করে গিয়ে আপনার নেম প্লেটখানা দেখে আসবো।

আপনি কিন্তু সুন্দর ইংরেজি বলতে পারেন।

বনহুর হাসলো।

তাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হচ্ছিলো।

লোকটা এবার উঠে দাঁড়ালো—আপনি পার্টিতে আসছেন তো?

বনহুর বললো—হাঁ, সেখানেই দেখা হবে আবার।

বেরিয়ে গেলো লোকটা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো। আপন মনেই বলে নিলো, তেরোতলার এক নম্বর ক্যাবিনে পার্টি আছে.....নাচবে শাম্মী, যাবে সে সেখানে।

পায়চারী করছে বনহুর।

কোনো এক ক্যাবিন থেকে পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছে।

হাতঘড়িটা দেখলো, এখনও সময় আছে কয়েক ঘন্টা। পুনরায় বসলো বনহুর শয্যায়, একখানা পত্রিকা সে তুলে নিলো হাতে। পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখলেও মন তার ছিলো গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কয়েক মিনিট পর পুনরায় পত্রিকা রেখে উঠে পড়লো বনহুর, স্যুটকেস খুলে বের করলো একটা ফটো। ফটোখানা আলোর সামনে মেলে ধরে ভালোভাবে দেখলো। একটা বৃদ্ধের ছবি। এবার বনহুর ফটোখানা হাতে নিয়ে প্রবেশ করলো বাথরুমে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না এ সেই মিঃ লিয়ন। ফটোখানার সঙ্গে নিজের চেহারা মিলিয়ে দেখে নিলো বনহুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

এবার বনহুর একটা ছড়ি হাতে দরজার দিকে পা বাড়ালো। মাজাটা একটু বাঁকা, মাথায় টুপি। ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে সোজা লিফটের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

লিফ্‌টে চেপে এগারো তলার বোতামে চাপ দিতেই লিফ্‌টে সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, এগারো তলায় পৌঁছে গেলো বনহুর।

লিফট এসে থামলো এগোরো তলায়।

বনহুর তার পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নেমে পড়লো লিফ্‌ট থেকে। এবার সে এগিয়ে চললো সাত নম্বর ক্যাবিনের দিকে।

পথে একজন লোক তাকে দেখেই সালাম জানিয়ে বললো—ওস্তাদ, আপনি এসে গেছেন?

হাঁ, চলো।

চলুন ওস্তাদ।

লোকটার পিছু পিছু বৃদ্ধবেশী বনহুর সাত নম্বর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের মধ্যস্থ সবাই উঠে দাঁড়ালো, একসঙ্গে সবাই উচ্চারণ করলো, আচ্ছালামো আলাইকোম।

বৃদ্ধবেশী বনহুর উচ্চারণ করলো—ওয়ালেকুম ছালাম.....

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু একজন উঠে দাঁড়ায়নি। লোকটা বসেই আছে, চেহারাটা যেন একটা জমকালো মহিষ। বিরাট দেহটার উপর ছোট্ট ফুটবলের মত একটা মাথা। বিড়ালের চোখের মত দুটো ক্ষুদে চোখ। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটা বলে উঠে—ওমন করে চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আজ যেন প্রথম আমাকে দেখছেন।

হঠাৎ বনহুর নিজের ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত নিজকে সামলে নেয়, হেসে বলে উঠে—আপনাকে বড্ড রোগা লাগছে তাই.....

ও! আমার শরীরটা ইদানীং বড় খারাপ হয়ে গেছে সিরাজ মিয়া। বসুন অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সিরাজ মিয়া এবার আসন গ্রহণ করলো।

অন্যান্য যে কয়েকজন লোক ক্যাবিনটার মধ্যে ছিলো তারাও বসে পড়লো।

একটা লোক বলে উঠলো—মালিক, চা আনবো না কি?

শরাব নিয়ে এসো। বললো মহিষ চেহারা লোকটা।

অনুচরটি বললো—পার্টিতে শরাব চলবে, এখন শরাব খেলে পার্টিতে যোগ দিতে পারবেন না মালিক।

বললাম পারবো, নিয়ে এসো।

আচ্ছা মালিক।

লোকটা বেরিয়ে গেলো।

এবার মহিষ আকার লোকটা সিরাজ মিয়াকে লক্ষ্য করে বললো—আলী জাফরীর কোনো সংবাদ পেয়েছেন মিয়া সাহেব?

সিরাজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—আলী জাফরীর সংবাদ তো দূরের কথা, জাহাজখানা গাদান বন্দরে পৌঁছালো কি না তাও জানতে পারিনি।

আমি গাদানে সংবাদ নিয়ে জেনেছি মিয়া সাহেব। আজ পর্যন্ত জাহাজ 'শাহানাশাহ' গাদান বন্দরে পৌঁছায়নি। আলী জাফরীর সঙ্গে ছিলো ইয়াসিন, আবদুল্লা, ইয়াকুব আর চিশতী। এদের কারো কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বড় চিন্তার কথা। সিরাজী মিয়া, এ জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম।

হাঁ, সব শুনলাম এখন কি করা যায় ভাবছি।

ভেবে কি হবে, ঠিক আলী জাফরী মাল নিয়ে কোথাও ভেগেছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। বেটা ভিতরে ভিতরে নতুন কোনো ফন্দি এঁটেছিলো।

দেখা যাক্ কবে আলী জাফরী ফেরে। ও পালাবে কোথায়? বৌ-বাচ্চা সব তো হায়দারাবাদেই রয়েছে। সোলেমান?

বলুন মালিক? সোলেমান জবাব দিলো।

তুমি আলী জাফরীর বাড়িতে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেবে। তারা যেন গোপনে সন্ধান রাখে কবে কখন আলী জাফরী বাড়িতে আসে বা যায়। মহিষ আকার লোকটা কথাগুলো বলে থামলো।

এবার সিরাজী মিয়া বললো—নতুন কোনো জাহাজ এখন .....কথা শেষ না করে থেমে পড়লো সে।

মহিষ চেহারা লোকটা বললো—'শাহানশাহ' ফিরে না এলে অসুবিধা হবে। প্রকাশ্য খোলা জাহাজে তো আর বন্দীদের পাঠানো যায় না। তবে কয়েকদিন পর জাহাজ 'ফিরোজ খাঁ' শুকনো মাছ নিয়ে গাদান যাবে, তখন ঐ জাহাজে কিছু বাঙ্গালী বন্দী পাঠানো হবে। আপনি কতগুলো বন্দী জোগাড় করেছেন সিরাজ মিয়া?

মাথা চুলকে বললো সিরাজ মিয়া—আমার বন্দীশিবিরে বেশি নেই, শুনেছি সাগাই দূর্গে বহু মাল আছে।

মালিকের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো—আপনি কিছু খোঁজ রাখেন না সিরাজ মিয়া, সাগাই দূর্গে যে সব বাঙ্গালী আদমীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে তারা কোনোদিন মুক্তি পাবে না। এদের সবাইকে খতম করতে হবে। কারণ এরা সব বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী। আমাদের সরকার বলেছেন বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর একটি লোকও যেন রেহাই না পায়।

ঠিক বলেছেন মালিক সাহেব। এরা বাইরে গেলে পাকিস্তানের বিপদ ঘটবে। শেষ পর্যন্ত নিয়াজী আর ফরমান আলীর মত আমাদের সদাশয় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সাহেবের গলায় দড়ি পড়তে পারে।

সিরাজী, আপনি বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন। কার সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলছেন.....

বুড়ো হয়ে গেছি তো, তাই হঠাৎ বেখেয়াল হয়ে পড়ি। সিরাজ মিয়া কথার ফাঁকে একটা ছোট্ট টেপ্ রেকর্ড বাক্স সোফার নিচে লুকিয়ে রেখে দিলো।

বললো আবার সিরাজ মিয়া—জাহাজ 'ফিরোজ খাঁ' শুকনো মাছ নিয়ে কবে গাদান অভিমুখে রওয়ানা দেবে আমাকে জানাবেন?

হাঁ জানাবো, আপনি কিছু মাল দেবার চেষ্টা করবেন?

নিশ্চয়ই করবো, নিশ্চয়ই করবো.....এখন তাহলে আসি। আমার টাকাটা নিতেই এসেছি গুলবাগে.....

ততক্ষণে বয় শরাবপাত্র এবং কিছু খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো।

মালিক বললো—কিছু পান করে যান সিরাজী সাহেব।

না আজ নয়। জরুরি একটা কাজে আমাকে উঠতে হচ্ছে।

মালিক সাহেব কয়েক বান্ডিল টাকা সিরাজীর হাতে দিয়ে বলে—আজ পঞ্চাশ হাজার দিলাম, নিয়ে যান.....

বাকিটা কবে দেবেন মালিক সাহেব?

কয়েক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন।

আচ্ছা, টাকার বান্ডিলগুলো পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ায়—চলি তাহলে?

আসুন। বললো মালিক সাহেব।

বেরিয়ে গেলো সিরাজী মিয়া।

পথেই দেখা হয় আসল সিরাজী মিয়ার সঙ্গে। প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি একটা দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে ফেলে বনহুর।

সিরাজী মিয়া সাত নম্বর ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই ক্যাবিনস্থ সবাই তাকায়—ব্যাপার কি, উনি আবার ফিরে এলেন কেন।

মালিক সাহেব বলে উঠলো—সিরাজী মিয়া ফিরে এলেন কেন?

সিরাজী আসন গ্রনণ করে বললো—কি বললেন?

হঠাৎ কি মনে করে আবার এলেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সিরাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মালিক সাহেবের মুখের দিকে। তারপর বললো—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি এসেছি আমার পাওনা টাকা নিতে।

মালিক সাহেব বলে উঠে—টাকা! কিসের টাকা? এই মাত্র তো টাকা নিয়ে গেলেন.....

আমি টাকা নিয়ে গেলাম, বলেন কি!

হাঁ—এরা সবাই জানে, সবাই দেখেছে, জিজ্ঞাসা করে দেখুন ।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠে—হাঁ, আপনি এইমাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গেছেন।

মিথ্যে কথা। আমি এইমাত্র এলাম.....

না, আপনি এসেছিলেন। বললো মালিক সাহেব।

না না, আমি আসিনি এবং টাকাও নেই নি।

মালিক সাহেব বলে উঠলো—সিরাজী মিয়া, আপনি মনে করেছেন আমাদের ধাপ্পাবাজি দিয়ে আবার টাকা আদায় করে নেবেন। পুলিশ—পুলিশ ডাকো!

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়লো, সব শুনে সিরাজী মিয়াকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো।

কথাটা অল্পক্ষণে সমস্ত হোটেলে ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর তার নিজের ক্যাবিনে বসে হাসলো।

অল্পক্ষণ পরে হারুন প্রবেশ করলো বয়ের বেশে, হাতে তার ছোট্ট টেপ্ রেকর্ড। যে টেপ্ রেকর্ডখানা কিছুক্ষণ আগে সে সাত নম্বর ক্যাবিনের একটি সোফার নিচে রেখে এসেছিলো।

হারুন টেপ্ রেকর্ডখানা বনহুরের সম্মুখে রেখে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সিরাজী মিয়াকে পুলিশ এরেষ্ট করেছে।

বনহুর বললো—যেমন কর্ম তেমনি ফল। সিরাজীর বন্দী শিবিরে কতকগুলো বাঙ্গালী বন্দী আছে?

প্রায় দু'শ' এখন আছে। আর দু'শ' বাঙ্গালী বন্দীকে সে গোপনে চালান করেছে। মালিক সাহেবের কাছে প্রায় দেশড়' বাঙ্গালী তরুণী বিক্রি করেছিলো.....

উপযুক্ত সাজা দিতে হবে বুড়োকে।

এবার বনহুর টেপ্ রেকর্ড অতি মৃদুস্বরে চালু করে শুনতে থাকে। সব শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

হারুন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। একটু পরে বলে উঠে—সর্দার, পার্টিতে যাবার সময় হয়ে গেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর। ও তাইতো.....টেপ্ রেকর্ড বন্ধ করে উঠে পড়ে এবার।

অল্পক্ষণ পর তৈরি হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পাকিস্তানে কেউ তাকে চেনে না বা জানে না। তাকে আত্মগোপন করে বা ছদ্মবেশে ও থাকতে হচ্ছে না। সম্পূর্ণ বিদেশী পোশাকে সজ্জিত হয়েছে বনহুর। এই পোশাকে তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

পার্টিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো গুলবাগ হোটেলের ম্যানেজার রিজভী সাহেব। তিনি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ লিয়নের। প্রত্যেকটা ক্যাবিন থেকে অতিথিরা এসেছেন। এরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোক।

হঠাৎ বনহুরের নজরে পড়লো সেই মহিষ আকার লোকটার উপর। এক পাশে তার বিরাট বপু নিয়ে মুখটা গম্ভীর করে বসে আছে।

রিজভী সাহেব বললেন—উনি আমাদের হোটেল গুলবাগের একজন অংশীদার। ওনার নাম মালিক নাদিরশাহ।

বনহুর হাত তুলে সালাম জানালো।

মালিক সাহেব সালামের উত্তর দিলো।

রিজভী সাহেব ললেন—বড় আফসোস, আজ এই আনন্দময় দিনে মালিক সাহেবের মন মোটেই ভালো নয়। আপনারা সবাই শুনে দুঃখিত হবেন। মিঃ সিরাজি মিয়ার ছদ্মবেশে এক একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত মালিক

সাহেবের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। তবে সিরাজী মিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউ কারো দিকে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলো না, মিস শাম্মী অদ্ভুত এক ড্রেসে সজ্জিত হয়ে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

ক্যাবিনের সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো শাম্মীর উপর।

ক্যাবিনের এক পাশে বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছে।

অতিথিবৃন্দ সবাই আসন গ্রহণ করেছেন।

আসনের সম্মুখের টেবিলে বয় খাবার এবং শরাবপাত্র সাজিয়ে রাখছে। ঝুড়িতে নানারকম ফলমূল রয়েছে। প্রত্যেকের সামনে একটি করে গোটা মুরগীর রোষ্ট। কাঁটা-চামচের প্লেটও দেওয়া হলো।

অতিথিবৃন্দ কাঁটা-চামচ হাতে তুলে নিচ্ছেন।

টুনটান শব্দ হচ্ছে।

শাম্মীর পায়ের নূপুরধ্বনি হলো, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের বুকে এক অপূর্ব ঝঙ্কার উঠলো। শুরু হলো শাম্মীর নাচ।

অতিথিবৃন্দের কাঁটা-চামচের শব্দের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট আওয়াজ মিলে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করছিলো। শাম্মীর অপূর্ব নাচ অতিথিবৃন্দের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে যেন।

শাম্মীর দু'চোখে আবেগ মেশানো মধুর হাসি। নাচের তালে তালে চরণের নূপুরধ্বনি। ক্যাবিনে উজ্জ্বল নীল আলো জ্বলছে।

হঠাৎ আলো নিভে গেলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা আর্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলো। সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। আলো জ্বলে উঠতেই দেখলো ওপাশে মহিষ আকার মালিক সাহেবের দেহটা নিচে পড়ে আছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে মেঝের মূল্যবান কার্পেটখানা।

আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাম্মীর নাচ থেমে গিয়েছিলো।

বাদ্যযন্ত্রীরাও বাজনা থামিয়ে ফেলেছিলো।

ক্যাবিনের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অতিথিগণের মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতেই কাঁটা-চামচ থেমে গেছে খাবারসহ। হঠাৎ একি হলো!

মালিক সাহেবের প্রাণহীন দেহটা সোফার নিচে চীৎ হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা। তার বুকের একপাশে একখানা সূতীক্ষ্ণ ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখলো ছোরার বাঁটখানা সোনার তৈরি।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এলো। পুলিশ মহলের কর্মকর্তাগণ সবাইকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলো কিন্তু কে কোথা থেকে মালিক সাহেবের বুকে ছোরা বিদ্ধ করলো তার কোনো হদিস মিললো না।

সমস্ত হোটেলে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। মালিক নাদিরশাহ খুন —এ কম কথা নয়! পাকিস্তান সরকারের একজন বড় হাতের লোক ছিলেন তিনি। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কেমন যেন দূর সম্পর্ক ভাই হতেন মালিক সাহেব। পাকিস্তানের বাঙ্গালী নির্যাতনের একজন অধিনায়ক ছিলেন তিনি। তার একটি নয়, পাকিস্তানের কয়েকটি বন্দীশিবির আছে। এ সব বন্দীশিবিরে বহু বাঙ্গালীকে আটক করে রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার মালিক নাদির শাহকে মাসে কয়েক লক্ষ টাকা দেন এসব ব্যাপারে। কাজেই এহেন মৃত্যু পাক সরকারের বিরাট একটা ক্ষতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মালিক শাহের শোকে গোটা পাকিস্তানে শোকের হাওয়া বয়ে গেলো।

❑

বনহুর পত্রিকাখানা ভাঁজ করে পাশের টেবিলে রেখে চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলো। পত্রিকাখানায় মালিক নাদিরশাহের রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম খবর ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও একটি খবর ছাপা হয়েছে— যে ব্যক্তি নাদিরশাহের হত্যা কারীর সন্ধান দিতে পারবে বা হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে দিতে সক্ষম হবে তাকে দু'লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পত্রিকাখানা ছিলো ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে আছে, আপন মনেই বলে উঠে সে.....সাতখানা আমি সঙ্গে এনেছিলাম, সবেমাত্র একখানা কাজে এলো.....

পিছন থেকে কে যেন কাঁধে হাত রাখলো বনহুরের।

বনহুর সম্মুখে আয়নায় তাকিয়ে দেখলো শাম্মী তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। বললো শাম্মী—সাতখানা কি সঙ্গে এনেছিলেন মিঃ লিয়ন?

সত্যি শুনতে চাও?

হাঁ।

ঐ যে আমার ব্যাগ দেখছো ওটা খুলে ফেললেই বুঝতে পারবে।

শাম্মী সঙ্গে সঙ্গে এগুতে গেলো ব্যাগের দিকে।

বনহুর ওর হাত ধরে ফেললো—ওতে কি আছে দেখবার পর তুমি এ ক্যাবিন থেকে ফিরে যেতে পারবে না শাম্মী।

কেন?

সে কথাও পরে জানতে পারবে।

সত্যি আপনি মাঝে মাঝে কেমন যেন আজগুবি কথা বলেন।

শাম্মী, আমি নিজেই তোমাকে দেখাবো, বসো।

বসলো শাম্মী।

বনহুর বললো—সেদিন তুমি অপূর্ব নেচেছিলে।

সত্যি বলছেন?

হাঁ, অদ্ভুত নেচেছো। পুরস্কার তোমাকে আজও দেওয়া হয়নি।

মিঃ লিয়ন আপনার ভাল লেগেছে আমার নাচ এটাই আমার পুরস্কার, অন্য কিছু আমি চাই না।

শাম্মী, সত্যি তুমি আমায় ভালবাসো, না?

হাঁ।

তুমি আজকের পত্রিকা পড়েছো?

হাঁ পড়েছি।

মালিক নাদিরশাহের হত্যাকারীকে যে ব্যক্তি ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দু'লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

হাঁ, পড়েছি।

যদি বলি আমিই সেই হত্যাকারী, তুমি দু'লাখ টাকার জন্য আমাকে কি ধরিয়ে দিয়ে ঐ টাকা গ্রহণ করতে পারো না?

হেসে উঠলো শাম্মী—যান, আপনি বড্ড যা তা বলেন হঠাৎ যদি কে শুনে ফেলে?

সত্যি, আমিই খুনী শাম্মী—

চুপ করুন। বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয় শাম্মী।

তুমি বিশ্বাস করছো না।

না—না।

তুমি কি দুই লাখ টাকা চাও না?

না।

আমি যদি সত্যি খুনী হই?

তবু পারবো না আপনাকে ধরিয়ে দিতে।

দু'লাখ টাকা চাও না?

না। দু'লাখ কেন, কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও আমি পারবো না আপনাকে.....

শাম্মী!

হাঁ, আমি আপনাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার কাছে টাকার কোন মূল্য নেই।

শাম্মী.....তুমি সত্যি অপূর্ব নারী। বনহুর ওর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে, তারপর বলে—আমি তোমাকে পেলে অনেক খুশি হবো। যা বলবো পারবে করতে শাম্মী?

বলুন পারবো।

শাম্মী, আমিই মালিক নাদিরশাহকে খুন করেছি!

আপনি!

হাঁ কিন্তু কেন করেছি সব তোমাকে বলবো। তবে এ হোটেলে নয়। কোনো নির্জন স্থানে তোমাকে সব বলবো। যাবে আজ আমার সঙ্গে?

যাবো।

বিশ্বাস করতে পারো আমাকে?

মিঃ লিয়ন, সত্যি বলছি আপনার সঙ্গে আমি যমালয়ে যেতে পারবো।

তাহলে আজ সন্ধ্যায় তুমি আর আমি.....

নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যার অন্ধকার গোটা লাহোরের উপরে নববধূর মত ঘোমটা টেনে দিয়েছে। পথের ধারে লাইট-পোষ্টগুলো আলোর মালার মত এখনও জ্বলে উঠেনি। দোকানে-গাড়িতে-বাড়িতেও আলো জ্বলেনি। হোটেল গুলবাগের সামনে একটি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। কারো প্রতীক্ষায় তাকালো সামনের দিকে।

এমন সময় এগিয়ে এলো শাম্মী, হ্যালো মিঃ লিয়ন, আপনি গাড়ির পাশে আর আপনাকে আমি খুঁজছি আপনার ক্যাবিনে।

বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

শাম্মী উঠে বসলো গাড়ির মধ্যে ড্রাইভিং আসনের পাশে।

বনহুর গাড়ির সম্মুখ দিয়ে ঘুরে ড্রাইভিং আসনে বসলো।

গাড়ি বেরিয়ে গেলো।

সিকাগো রোড ধরে জাহাঙ্গীর রোডের দিকে গাড়ি ছুটে চললো। সম্মুখে হিম্‌সাহ পার্ক। পার্ক ছেড়ে গাড়ি এগুলো লেকের দিকে। হিমসাহ পার্কের দক্ষিণে একটি লেক। রাভী নদীর একটি শাখা শুকনো পাথুরিয়া মাটি খুঁড়ে এগিয়ে এসেছে হিমসাহ পার্কের দিকে।

লেকের ধারে নির্জন একটা জায়গায় গাড়ি এসে থামলো। নেমে পড়লো বনহুর, শাম্মী ও নেমে এলো গাড়ি থেকে।

বনহুর আর শাম্মী লেকের ধারে একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে পড়লো। চারিদিকে সম্পূর্ণ জনশূন্য প্রান্ত। সম্মুখে লেকের স্বচ্ছ সাবলীল জলধারা, কুলকুল করে বয়ে চলেছে। এই শুকনো মরুভূমির দেশে লেকভরা পানি সুন্দর দেখাচ্ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার দূর করে চাঁদ উঠেছে পূর্বাকাশে। মহানগরী লাহোরে অসংখ্য বিজলীবাতির আড়ালে চাঁদ কোনোদিন নজরে পড়ে না। আজ শাম্মী প্রাণভরে চাঁদের দিকে তাকালো—ভারী সুন্দর!

কি সুন্দর? বললো বনহুর।

ঐ চাঁদটা। ঠিক আপনার মত সুন্দর মিঃ লিয়ন।

না না, ঠিক তোমার মত শাম্মী। পুরুষরা কোনো দিন চাঁদের মত সুন্দর হতে পারে না। পুরুষদের সৌন্দর্য বড় নীরস, মাধুর্যহীন.....

যা তা বলছেন আপনি। সত্যি মিঃ লিয়ন, জীবনে আমি বহু পুরুষের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু আপনার মত পুরুষ দেখিনি।

রূপে না গুণে?

দুটোকেই আপনি জয় করে নিয়েছেন মিঃ লিয়ন।

যাক ওসব কথা, এবার আসল কথায় আসা যাক। মানে যে কথার জন্য আমরা এখানে এসেছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে যায় শাম্মী, তারপর বলে—বলুন?

শাম্মী, তোমার কাছে মানুষ বড় না জাতটাই বড়? যেমন ধরো বাঙ্গালী, বিহারী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইরানী, কাশ্মীরী অনেক রকম জাতের মানুষ আছে তো?

আমার কাছে মানুষ বড়?

তুমি অবাঙ্গালী, ধরো আমি যদি বাঙ্গালী হই; পারবে আমাকে ভালবাসতে?

মিঃ লিয়ন, আপনি যাই হোন না কেন, আমি আপনাকে ভালবাসবোই। তা ছাড়া আমার তো কোনো জাতবিচার করে লাভ নেই। কারণ আমাকে হোটেল গুলবাগে মানুষের মনস্তুষ্টির জন্যই রাখা হয়েছে। সেখানে নানা জাতের মানুষের আনাগোনা। সবাইকে খুশি করাই আমার কাজ.....কথাগুলো খুব বেদনাভরা গলায় বলে শাম্মী।

বনহুর বুঝতে পারে শাম্মীর ব্যথা কোথায়, সান্ত্বনার সুরে বলে বনহুর—শাম্মী, তুমি নিজের জন্য ব্যথিত হচ্ছো কিন্তু আজ তুমি ভেবে দেখো তোমার মত কত মা-বোনদের উপর চালানো হচ্ছে জোরপূর্বক পাশবিক অত্যাচার। অগণিত বাঙ্গালী তরুণীকে বন্দীশিবির থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে, তাদের জাহাজে করে চালান দেওয়া হচ্ছে বিদেশে। বিক্রি করা হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। যারা এই অসহায় তরুণীদের কিনে নিচ্ছে তারা এদের দিয়ে পয়সা উপার্জন করছে নানাভাবে। কেউ হোটেলে, কেউ ক্লাবে, কেউ অসৎ পল্লীতে গিয়ে পড়ছে। অমূল্য সম্পদ ইজ্জত বিকিয়ে তারা মালিকের ঐশ্বর্য আর অর্থ বাড়াচ্ছে। বলো শাম্মী, ভেবে দেখো একবার এদের অবস্থার কথা।

শাম্মীর গণ্ড বেড়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বলে সে—মিঃ লিয়ন, ঠিক আমার অবস্থাও আজকের বন্দীশিবিরে বাঙ্গালী তরুণীদের মত। আমার দেশ হলো ইরানে। আমি জন্মাবার পর আমার বাবা মরে যাওয়ায় মা আমাদের তিন বোন আর তিন ভাইকে নিয়ে খুব কষ্টে পড়লো। দিন আর যায় না, মা এক জুট মিলে কোনো একটা কাজ করার জন্য চাকরি পেলো। মাইনে সামান্য, তাতে সংসার চালানো মুস্কিল হলো। আমরা তখন বেশ বড় হয়ে গেছি। খাবার যা পাক হতো তাতে চলতো না। বেশি পরিশ্রমে মার শরীর ভেংগে পড়লো। মা কোনো কোনো দিন কাজে যেতে না পারলে আমাকে পাঠাতো। কথা বলতে বলতে থামলো শাম্মী, বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—দেখুন হঠাৎ আমার নিজের কথায় চলে গেছি, মাফ করবেন।

বনহুর বলে উঠলো—বলো শাম্মী, আমি তোমার জীবন কাহিনী শুনতে চাই?

আমার ঘৃণ্য জীবন কাহিনী শুনলে আপনার মন আমার প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠবে।

মোটেই না। বলো?

শাম্মীর চোখেমুখে একটা করুণ ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টি যেন চলে গেছে দূরে, অনেক দূরে। বহুদিন আগের এক দিনে ফিরে যায় সে, বলে—মা সেদিন যেতে পারেনি তাই মায়ের পরিবর্তে আমি গেলাম মিলে কাজ করতে। কাজ করছি হঠাৎ একটা লোক এসে বললো, বড় সাহেব ডাকছেন।

আরও কয়েকবার বড় সাহেবের ঘরে গেছি মায়ের সঙ্গে। তাই বড় সাহেবের ঘর আমার পরিচিত ছিলো। হাতের কাজ রেখে গেলাম বড় সাহেবের ঘরে। ঘরে প্রবেশ করেই চমকে উঠলাম, বড় সাহেবের টেবিলে মদের বোতল আর গেলাস। আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো, জড়িত কণ্ঠে বললো—এসো জেরিনা। আমার নাম আগেই একদিন মায়ের কাছে জেনে নিয়েছিলো সে। আমি বড় সাহেবের চেহারা দেখে শিউরে উঠলাম। আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। হঠাৎ খপ করে আমাকে ধরে ফেললো বড় সাহেব। আমি চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু সেই পাষাণ দেয়াল ভেদ করে আমার চিৎকার বাইরে গেলো কিনা জানি না, কারণ কেউ এলো না আমাকে বাঁচাতে।

বনহুরের হাতখানা মুষ্ঠিবদ্ধ হলো, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে শুনে যাচ্ছে শাম্মীর জীবন কাহিনী।

শাম্মী বলে চলেছে—আমাকে ধরে নিয়ে পাশের কক্ষে গেলো বড় সাহেব। অনেক চেষ্টা করলাম নিজকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কিন্তু পারলাম না। আমকে যখন সে মুক্তি দিলো তখন আমার জ্ঞান আছে কিনা জানি না। বড় সাহেব আমার হাতে দু'খানা একশ'টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললো—যা।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তারপর?

আমি তখন সম্বিৎহারার মত ফিরে এলাম বাসায়। মায়ের হাতে দু'শ' টাকা গুঁজে দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। মা কি বুঝলো বা কি ভাবলো জানি না, দু'শ' টাকা হাতে পেয়ে তার চোখ দুটো খুশিতে জ্বলে উঠলো। অভাবী-অনাহারী মায়ের মুখে হাসি দেখে আমার কান্না থেমে গেলো। ভাবলাম এই বুঝি দুনিয়ার নিয়ম। বয়স কম থাকায় বুঝতে পারিনি সেদিন যা হারালাম তার কোনো মূল্য হয় না।

টাকার লোভে মা-ই আমাকে পাঠালো পরদিন।

আমি ভয় পেলেও খুব ঘাবড়ে গেলাম না। নিজকে শক্ত করে নিলাম বড় সাহেবের করাল গ্রাসকে সহ্য করার জন্য। বড় সাহেব আমাকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা।

আমার মায়ের অভাব আর রইলো না।

তারপর? প্রশ্ন করলো বনহুর।

তারপর একদিন মায়ের হাতে বহু টাকা তুলে দিয়ে আমাকে বড় সাহেব কিনে নিলেন একেবারে। এক বাংলোয় আমাকে রেখে দিলেন যত্ন করে। অভাব-অভিযোগের কথা ভুলে গেলাম। বড় সাহেব ইচ্ছামত আসতেন, কখনও কখনও দু'তিন জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসতেন সঙ্গে করে। সমস্ত রাত তারা আমার উপর চালাতো নির্যাতন। নাচগান সব শিখতে হলো তাদের মনস্তুষ্টির জন্য। বড় সাহেব আমার নাম দিলেন শাম্মী। আমাকে নিয়ে এলেন লাহোরে। সেই বড় সাহেবের এ হোটেল। এখনও আমি তার হোটেলে কাজ করি এবং মাসে পাই বিশ হাজার।

শাম্মী, আজ তুমি বড় সুখী, না?

সত্যি বিশ্বাস করুন আমি মোটেই সুখী নই।

কেন? একদিন যে শাম্মী বিশটা পয়সার জন্য উন্মুখ ছিলে, আজ সেই শাম্মী বিশ হাজার পাও.....

পয়সায় মানুষ সুখী হয় না মিঃ লিয়ন। যে অমূল্য রত্ন ইজ্জত আমি হারিয়েছি আর কোনোদিন কি তা ফিরে পাবো? যত সুখীই লোকে আমাকে মনে করুক আমি বড় অসহায়, বড় ঘৃণার পাত্র।

না, তুমি ঘৃণার পাত্র নও শাম্মী। নিজের ইচ্ছায় নয়, শয়তান তোমাকে জোর করে নষ্ট করেছে, এজন্য তুমি ঘৃণার পাত্র নও। তুমি নিষ্পাপ, তুমি পবিত্র।

মিঃ লিয়ন!

হাঁ শাম্মী। তুমি জানো না, বাংলাদেশের কত অসহায় নারীর উপর পাকিস্তানী বর্বর জল্লাদ সৈন্যবাহিনী পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। আজ সেই অসহায় মেয়েরা গর্ভবতী। চিন্তা করে দেখো এদের কি অপরাধ। জোর করে এদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে, তাহলে কি এরা দোষী? না, কখনোই না। এইসব মা-বোন অন্যান্য নারীর মতই নিষ্পাপ। শাম্মী, যে তোমার ইজ্জত নষ্ট করে তোমাকে আজ হোটেলের নাচনেওয়ালী সাজিয়েছে, বলো—

দেখিয়ে দাও তাকে, আমি তার উপযুক্ত সাজা দেবো। যেমনি দিয়েছি মালিক নাদিরশাহকে।

মিঃ লিয়ন!

হাঁ। , আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

শাম্মী বললো—বড় সাহেব যেখানে থাকেন সেখানে কি করে আপনি যাবেন? কারো সাধ্য নেই সেখানে যায় বা তাকে স্পর্শ করে।

শাম্মীর কথায় হেসে উঠে বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, সে হাসি যেন থামতে চায় না। নির্জন লেকের ধারে জ্যোছনাপ্লাবিত রাতটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শাম্মী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—শাম্মী, মনে রেখো লিয়নের অসাধ্য কিছু নেই। একটু থেমে বললো—শাম্মী, জানো আজ তোমাকে কেন এই নিভৃতে নিয়ে এসেছি।

জানি, আপনি কিছু বলবেন বলে.....

হাঁ, শুধু বলবো নয়, তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি আমাকে ভালোবাসো সেই বিশ্বাসেই আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। তুমি সুন্দরী নারী, তাই পারবে.....

বলুন কি করতে হবে?

যেতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে।

কোথা?

শিয়ালকোটে। শিয়ালকোটের রাজারবাগে কয়েকটি বন্দীশিবির আছে। ঐসব বন্দীশিবিরে প্রায় তিন শ' বাঙ্গালী তরুণী বন্দী অবস্থায় আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বিদেশে পাঠানো হবে। শাম্মী, এসব বন্দী তরুণীকে রক্ষা করতে হবে.....একটু থামলো বনহুর, তারপর বললো—এই বন্দীশিবিরগুলোর মালিক পাকিস্তানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমি চাই তুমি তাকে ভুলিয়ে এই বন্দীশিবিরগুলোর সন্ধান জেনে নেবে এবং আমাকে জানাবে।

একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজারবাগ বন্দীশিবিরগুলোর মালিক?

হাঁ।

আমি জানি, সেই নরপশু প্রতিদিন এইসব বন্দীশিবিরে যায় এবং সুন্দরী তরুণীদের বাছাই করে নিয়ে আসে তার বিশ্রামাগারে। তুমি পারবে শাম্মী বন্দীশিবিরগুলোর সন্ধান দিতে?

শাম্মী একটু হাসলো।

বনহুর ওর একখানা হাত তুলে নিলো হাতের মুঠায়, বললো—শাম্মী, তারা বাঙ্গালী বলে তাদের প্রতি তুমি নির্দয় ব্যবহার করো না।

মিঃ লিয়ন, আপনাকে আমি বলেছি জাত আমি বুঝি না, মানি না। আমি মানুষকে ভালোবাসি। বাঙ্গালী হলেও তারা আমার বোন.....

শাম্মী, জানি তুমি মহৎহৃদয় নারী জানি অর্থের মোহে তুমি কিছু করবে না, তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করবো...

আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনাকে স্পর্শ করে আমি বলছি, যথাসাধ্য সাহায্য করবো আপনাকে।

তুমি হোটেল গুলবাগ থেকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে নাও।

হাঁ, তাই নেবো। মিঃ লিয়ন, প্রাণ দিয়ে আমি বন্দী তরুণীদের মুক্তির চেষ্টা করবো!

শাম্মী! তুমি ঠিক ঐ চাঁদের মতই স্বচ্ছ। বড় সুন্দর তুমি, তোমার মনও বড় সুন্দর.....বনহুর শাম্মীর চিবুকটা তুলে ধরে চাঁদের আলোয় দেখতে পায় তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি কাঁদছো?

না।

এই তো তোমার চোখে পানি। বলো তুমি কেন কাঁদছো শাম্মী? বলো?

মিঃ লিয়ন, এতোকাল সবাই আমাকে ভোগ করার জন্যই নানাভাবে আমার সৌন্দর্যের বর্ণনা করে এসেছে যাতে আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাই। কিন্তু আপনি নির্জনে পেয়েও কোনোদিন আমাকে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আপনার নিঃস্বার্থ প্রাণঢালা ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে, তাই নিজের অজ্ঞাতেই চোখে পানি এসে গেছে.....আঁচলে অশ্রু মুছে বলে শাম্মী—চলুন এবার উঠা যাক।

চলো শাম্মী।

বনহুর আর শাম্মী অদূরে থেমে থাকা গাড়িখানায় উঠে বসলো।

রাজারবাগ নূরজাহান মহল। কথাটা বলে শাম্মী গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

পিছনের আসনে বসে আছে শাম্মী। তার দেহে আজ নতুন ধরনের পোশাক। কতকটা বিলেতী পোশাক বলা চলে। তার সুন্দর দেহে অপূর্ব মানিয়েছে পোশাকটা। মাথায় হাল্কা ধরনের ক্যাপ।

এ পথ সে পথ ঘুরে গাড়িখানা রাজারবাগের তেরো নম্বর রোড ধরে এগিয়ে চললো। রাজারবাগের এ অঞ্চলে শুধু ধনবান লোকদের বসবাস। এক একটা বাড়িকে রাজপ্রাসাদ বলা চলে।

প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে দারোয়ান বন্দুক কাঁধে পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির আশেপাশে নানারকম ঝাউ গাছ আর ফুলগাছের সমারোহ।

গাড়িখানা এসে থামলো এবার তেরো নম্বর রোডের নূরজাহান মহলের সম্মুখে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

শাম্মী নেমে পড়লো। হাল্কা হিলওয়ালা জুতোর খুট খুট শব্দ তুলে এগিয়ে গেলো সে বাড়ির গেটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

শাম্মী এগিয়ে চললো। কিছুদূর এগুতেই আরও একটি গেট। দারোয়ান বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। শাম্মীকে দেখে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। এগিয়ে চললো শাম্মী।

আরও কিছু চলার পর দেখলো দু' জন বন্দুকধারী পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শাম্মী কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললো।

দারোয়ান দু'জন পথ ছেড়ে দিলো।

শাম্মীর দেহে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

আরও কিছু চলার পর কোমরের বেল্টে রিভলভার ধারী সাদা পোশাক পরা দু'জন দারোয়ান শাম্মীর পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

শাম্মী এবার কথা বললো—আমির হোসেন নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করবো।

সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো দারোয়ানদ্বয়।

এগিয়ে চললো শাম্মী। যদিও তার মেন বিস্ময়ের শেষ নেই। জীবনে সে বহু দেখেছে, বহু ধনকুবেরের বাড়িতে সে গেছে কিন্তু এমন বাড়িতে সে কোনোদিন আসেনি বা যায়নি। এতো পাহারাবেষ্টিত বাড়িও সে দেখেনি কোনোদিন। প্রেসিডেন্ট ভবনেও বুঝি এমন সতর্ক পাহারা নেই।

শাম্মী আরও কিছু এগুতেই দেখলো বিরাট গাড়ি বারান্দায় দু'জন রিভলভারধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই তারা জিজ্ঞাসা করলো—কাকে চান?

শাম্মী ভিতরে ভিতরে বেশ ঘাবড়ে উঠেছিলো, মুখে সাহস টেনে বললো—নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বললো একজন—এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যান।

শাম্মী তাকিয়ে দেখলো সম্মুখে একটি সিঁড়ি। সে ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। সিঁড়ির মুখেই দু'জন পাহারাদার, তারা শাম্মীকে বাধা দিলো।

শাম্মী বললো—নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করবো।

পাহারাদারদের একজন একটা কলিং বেলে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দু'জন যুবতী এসে দাঁড়ালো।

পাহারাদারটি বললো—মালিকের সঙ্গে দেখা করবে এই মেয়েটি।

এরা সবাই উর্দুভাষী। আসলে শাম্মীও উর্দুতেই সব সময় কথাবার্তা বলে। বনহুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরেজিতে কথা বলে। পাকিস্তানে আসার পর বনহুর মিঃ লিয়নের বেশে সব সময় ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। সে যে বাঙ্গালী কেউ জানে না, জানবার কোনো উপায়ও নেই। শাম্মীও ভাল ইংরেজি জানে, কাজেই কোনো অসুবিধা হয় না।

যুবতীদ্বয়ক শাম্মীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

আরও উপরে একটি কক্ষের মধ্যে এসে তরুণীদ্বয় শাম্মীকে বললো—বসুন।

শাম্মী চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। বহু বাড়ি সে দেখেছে কিন্তু এমন বাড়ি শাম্মী কোনোদিন দেখেনি। কক্ষটার মধ্যে মূল্যবান সোফা, মূল্যবান টেবিল, মেঝেতেদ মূল্যবান কার্পেট বিছানো কিন্তু সব জিনিসের রং জমকালো। কক্ষমধ্যে একটি নীলাভো আলো জ্বলছে। নীলাভো আলোতে জমকালো জিনিসপত্রগুলো চক্‌চক্ করছে। সবচেয়ে অবাক হলো শাম্মী, কক্ষের মধ্যে কয়েকটি ত্রিপয়ার উপরে হিংস্র জীবজন্তুর মূর্তি। ভয়ঙ্কর হা করে আছে, দাঁতগুলো আশ্চর্য ধরণের। হিংস্র জীবগুলোর রংও জমকালো।

শাম্মী অবাক হয়ে দেখছে, হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর চমকে ফিরে তাকালো সে। দেখলো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঠিক দরজার মুখে। লোক তো নয় যেন একটা গরিলা। কতকটা হোটেল গুলবাগের মালিক নাদিরশাহের মত চেহারা, তবে ওর গায়ের রং মহিষের মত, এর গায়ের রং হাতির মত।

শাম্মী জানে না সে কতক্ষণ এই কক্ষে প্রবেশ করে এসব অবাক হয়ে দেখছিলো। হুশ হলো লোকটার কথায়—আপনি কাকে চান?; লোকটার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

শাম্মী ঢোক গিলে বললো—আপনি কি নিয়াজী সাহেব?

হাঁ, আমিই আমির হোসেন নিয়াজি। তা কি মনে করে এতোদূরে এসেছেন মিস সুন্দরী? লোকটা এবার এগিয়ে এলো।

শাম্মী শিউরে উঠলো।

আমির হোসেন নিয়াজীর চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস। শাম্মীকে দেখে সে অনেক আনন্দ লাভ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বললো—বসুন মিস সুন্দরী।

আমার নাম সুন্দরী নয়—মিস শাম্মী।

শাম্মী...মিস শাম্মী...চমৎকার নাম। বলুন এ অধমের কাছে কি প্রয়োজন?

আমির হোসেন যেন মোমের পুতুলের মত গলে গেলো।

শাম্মী ভয় পেয়ে গেলেও মুখোভাবে নিজকে সংযত রেখে কথা বলছে। বললো—আমি লাহোর গুলবাগ হোটেল থেকে এসেছি।

ও, আপনি হোটেল গুলবাগের সেরা সুন্দরী শাম্মী? আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনার সৌন্দর্যের কথা আমার মনে দাগ কেটেছে কিন্তু অনেক কাজের ঝামেলায় আজও আপনাকে স্বচক্ষে দেখতে পারিনি। আজ আমার জীবন সার্থক হলো মিস শাম্মী। এবার বলুন কি আদেশ.....

আমিও অনেক দিন আপনার নাম শুনেছি, আপনার গুণ ও সুনামের প্রশংসা আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। তাছাড়া আপনি তো একজন মহাপুরুষ, আপনাকে নিজের চোখে দেখবো বলে এসেছি।

সত্যি বলছেন মিস শাম্মী?

সত্যি, আপনাকে আমি দেখতে এলাম কারণ আপনার গুণাগুণ শুনে শুনে আমার ধাঁধা লেগে গেছে। তাই এলাম আপনার সাক্ষাৎলাভ করতে।

আমার সৌভাগ্য মিস শাম্মী।

আমারও সৌভাগ্য। একটু থেমে বললো শাম্মী—মিঃ নিয়াজী, আপনার বন্দীশিবিরে কতগুলো বাঙ্গালী তরুণী আছে আমি একটু দেখতে চাই, কারণে আমাদের কয়েকটি তরুণী দরকার।

বেশ বেশ,অনেক তরুণী আছে— অপূর্ব সুন্দরী।

যত টাকা চান তাই পাবেন.....

সে পরে হবে—আগে টাকার কথা নয় আগে মাল দেখুন।

হাঁ, আমি তাই দেখতে চাই। তবে কষ্ট করে যদি.....

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...বলুন।

আমি এক্ষুণি যেতে চাই।

বেশ তো চলুন।

আমার গাড়ি সঙ্গে আছে, আপনি দয়া করে আমার গাড়িতেই চলুন। মিস শাম্মী কথাগুলো অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বললো।

মিঃ নিয়াজীর চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

শাম্মী ভ্যানিটি খুলে রুমালে মুখটা মুছে নেয়।

নিয়াজী বললো—চলুন আমি প্রস্তুত আছি।

শাম্মীর সঙ্গে যেতে মন তার খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। উঠে পড়ে বললো—চাবীর গোছা নিয়ে আসি।

শাম্মী বললো—চাবির গোছা! সে কি, চাবি আপনি রাখেন.....

হাঁ মিস শাম্মী, তরুণীদের আমি বাছাই করে ভিন্ন এক বন্দীশিবিরে রেখেছি। তাছাড়া চাবি আমি নিজের কাছেই রাখি।

বুঝেছি, আচ্ছা চাবি নিয়ে আসুন।

মিঃ নিয়াজী ভিতরে চেলে গেলো, একটু পরে ড্রেস পরিবর্তন করে ফিরে এলো—সঙ্গে একটা বয়, হাতে তার বিরাট একটি চাবির গোছা।

শাম্মীসহ নিয়াজী নেমে এলো নিচে।

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো ড্রাইভার।

নিয়াজী উঠে বসলো।

শাম্মীর ও তাকে অনুসরণ করলো।

গাড়ি কয়েকটা লৌহফটক পেরিয়ে বড় গেটে এসে থামলো।

শাম্মী বললো—এই তো আমার গাড়ি।

এবার শাম্মী নিজে নেমে দরজা খুলে ধরলো। নিয়াজী নেমে পড়লো। চাবির গোছাটা নিয়াজী গাড়িতে উঠবার সময় নিজের কাছে নিয়ে রেখেছিলো।

চাবীর গোছা নিয়ে নেমে পড়ে নিয়াজী সাহেব।

ততক্ষণে শাম্মীর গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে ধরেছে।

নিয়াজী তার বিশাল বপু নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। শাম্মী বসলো তার পাশে।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

কিছুক্ষণ চলার পর বললো শাম্মী—নিয়াজী সাহেব, আমার কতবড় সখ আপনার সবগুলো বন্দীশিবির দেখি।

বেশ তো, এটা আমার খুশির কথা। এবার নিয়াজী পথের নির্দেশ দিলো।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চললো। তার দৃষ্টি শুধু সম্মুখে।

শাম্মী আর নিয়াজীর মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিলো সব কান পেতে শুনছিলো ড্রাইভার।

একটা নির্জন পথ ধরে গাড়িখানা এখন এগিয়ে চলেছে। এ পথে তেমন কোনো যানবাহন চলাচল করছে না। পথটা অত্যন্ত প্রশস্ত।

ড্রাইভার আমির হোসেন নিয়াজীর নির্দেশমতই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

একটা পোড়োবাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো।

নিয়াজী সাহেব এবার নেমে পড়লেন।

শাম্মীকে নামবার জন্য বললেন এবার তিনি।

শাম্মীও নামলো।

নিয়াজী হাত বাড়ালেন ওর হাতখানা ধরবার জন্য। শাম্মী আলগোছে হাতখানা এগিয়ে দিলো।

দু'জন হাত ধরে অতি আপন জনের মত পোড়োবাড়িখানার দিকে এগুলো। শাম্মী বললো—এটা বুঝি আপনার.....

হাঁ, আমার এক নম্বর বন্দীশিবির।

দরজায় পৌঁছতেই একটা পাঞ্জাবী দারোয়ান দরজা খুলে দিলো।

হোসেন নিয়াজী আর শাম্মী এগিয়ে গেলো ভিতরের দিকে।

কিছুটা চলার পর শাম্মী দেখলো বিরাট একটা কক্ষের দরজায় প্রচন্ড একটি তালা লাগানো রয়েছে।

নিয়াজী সাহেব নিজের চাবীর গোছা বের করে চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলে। দরজা খুলতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তা হৃদয়বিদারক। শাম্মীর দু'চোখ বিস্ময়ে ভরে উঠলো, সে দেখতে পেলো কতগুলো তরুণী সেই কক্ষমধ্যে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। দরজা খোলা হতেই তরুণীরা দু'হাতের আড়ালে উন্মুক্ত বক্ষ ঢেকে রাখার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো। দীর্ঘ

কয়েক মাস এরা বন্দী থাকা অবস্থায় জামা-কাপড় এদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এতোটুকু ন্যাকড়া দিয়ে দিয়ে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ করেছে। রুক্ষ চুল, কোটরাগত চোখ। চুলগুরো যেন জটা ধরে গেছে একেবারে!

আমির হোসেন নিয়াজী শাম্মীকে লক্ষ্য করে বললো—দেখুন কোন্ মেয়েগুলো আপনার পছন্দ হয়?

শাম্মী সবাইকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখলো, তারপর বললো—আপনার প্রত্যেকটা বন্দীশিবির দেখতে চাই, কতগুলো বাঙ্গালীকে আপনার লোক আটক করতে সমর্থ হয়েছে।

এ তো খুশির কথা, চলুন আপনাকে আমার সব কয়টা বন্দীশিবির দেখাবো। বাঙ্গালী বাচ্চাদের আমি উচিত সাজা দিচ্ছি। এক নম্বর দেখলেন, এবার দু'নম্বর শিবিরে চলুন।

এক নম্বর শিবির থেকে দু' নম্বরে যাবার জন্য মিস শাম্মী ও আমির হোসেন নিয়াজী গাড়িতে চেপে বসলো। নিয়াজী সাহেব ড্রাইভারকে ঠিকানা বললো।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

ঘন্টাখানিক চলার পর একটা বিরাট বাড়ির সম্মুখে এসে গাড়ি থামলো। বাড়িখানা ঠিক পোড়াবাড়ীর না হলেও নতুন ঝকঝকে নয়। ইট্ জিরজিরে দাঁত বের করা দেয়াল। মস্তবড় প্রাচীরে বাড়িখানা ঘেরাও করা রয়েছে। দরজায় গাড়ি থামতেই নেমে পড়লো আমির হোসেন। শাম্মীও নেমে পড়লো।

দরজার কাছে এগুতেই একজন লোক দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো।

আমির হোসেন নিয়াজী শাম্মীকে লক্ষ্য করে বললো—ভিতরে আসুন।

আমির হোসেনকে অনুসরণ করলো শাম্মী।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো শাম্মী, এটা আসলে বাড়ি নয়—একটা গুদাম। সম্মুখে কতকগুলো ছোটবড় ঘর তারপর বিরাট প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গনের পর একটা মস্তবড় প্রশস্ত গুদামঘর। আমির হোসেন নিজে চাবি দিয়ে গুদামকক্ষের দরজা খুলে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য শাম্মীর নজরে পড়লো সে অতি মর্মান্তিক।

দেখালো শাম্মী, কতকগুলো যুবক-বৃদ্ধ এবং শিশু-বালক-বালিকা একত্রে এই গুদামে বস্তা বোঝাইয়ের মত করে আটকে রেখেছে। জীর্ণশীর্ণ

কঙ্কালসার চেহারা, মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া বিদ্যমান। একসঙ্গে এতোগুলো লোকের এই করুণ অবস্থা শাম্মীর চোখে পানি এনে দিলো।

নিজকে সামলে নিয়ে বললো শাম্মী—চলুন এর পরের বন্দী শিবিরটা দেখতে চাই।

চলুন।

পরপর কয়েকটা বন্দীশিবির দেখে ফিরে চললো শাম্মী সেদিন, আমির হোসেনের কাছে আবার আসবে বলে বিদায় নিয়ে।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

শাম্মী বসে আছে পিছন আসনে।

একটা নির্জন পথ ধরে গাড়ি চলছিলো, সহসা গাড়ি থেমে পড়ে।

শাম্মী বলে—ড্রাইভার, গাড়ি রুখলে কেন?

এবার ড্রাইভার তার মুখ থেকে গোঁফ ও দাড়ি খুলে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে শাম্মী—মিঃ লিয়ন, আপনি!

হাঁ, আমিই তোমার সঙ্গী হিসাবে ড্রাইভার বেশে ছিলাম। ধন্যবাদ শাম্মী, যে কাজের জন্য আমি তোমাকে এ কষ্ট স্বীকারে বাধ্য করেছিলাম, সে কষ্ট স্বীকার তোমার সার্থক হয়েছে। আমির হোসেনের বন্দীশিবিরগুলোর ঠিকানা আমার আগে থেকেই জানা ছিলো।

শাম্মীর দু'চোখ থেকে বিস্ময় তখনও কাটেনি, বলে শাম্মী—সত্যি আপনি অদ্ভুত মানুষ। আমি আপনাকে একটুও চিনতে পারিনি।

শাম্মী, তোমার সাহায্য আমার একান্ত কামনা।

মিঃ লিয়ন আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজকে ধন্য মনে করবো।

পথে তেমন কোনো আর কথা হলো না।

❑

—রহমান, সব প্রস্তুত হয়েছে তো?

—হাঁ সর্দার।

—খাবার পানি ও খাবার প্রচুর পরিমাণ নিয়েছো?

—নিয়েছি।

আজ ভোর রাতেই জাহাজ ছাড়বে, বুঝলে?

বুঝেছি সর্দার।

রাত তিনটার মধ্যে আলো নিভিয়ে দেবে। সমস্ত বন্দর যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। রহমান, তুমি থাকবে জেটিতে আর কায়েস থাকবে জাহাজে। জাহাজের সিঁড়ি নামানো থাকবে, বন্দীরা জাহাজে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়বে।

হাঁ সর্দার, আপনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই কাজ হচ্ছে।

তবু আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম কোনো রকম যেন ভুল না হয়। কাওসার, হারুন, আহসান, রামসিং এরা সবাই যেন প্রস্তুত থাকে রহমান?

বলুন সর্দার?

এরা সবাই গাড়ি পেয়েছে তো?

হাঁ সবাই গাড়ি সংগ্রহ করে নিয়েছে। মিস্ শাম্মীই গাড়ি গুলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে সর্দার।

বেশ ভালো। কিন্তু শাম্মীকে আজ সমস্ত দিন খুঁজেও পাইনি।

রহমান বললো—মিস শাম্মী তার মালিকের গাড়িগুলো চেয়ে নিয়েছিলো তার কোনো এক বান্ধবীর বিয়ের ব্যাপারে গাড়ির দরকার জানিয়ে। হয়তো মিস শাম্মী তাই সরে গেছে সবার সম্মুখ থেকে।

বনহুর একটু হেসে বললো—ভালোই বুদ্ধি করেছে মেয়েটি।

রহমান বললো—সর্দার, কি বলবো মিস শাম্মী যেভাবে আমাদের সহায়তা করে চলেছে তাতে আমরা বিস্মিত। একটি অবাঙ্গালী মেয়ে হয়ে বাঙ্গালী বন্দীদের উদ্ধারের জন্য যেভাবে চেষ্টা করছে সত্যি প্রশংসনীয়।

হাঁ, ক'দিনের পরিচয় ওর সঙ্গে তবু ওকে দেখলে মনে হয় যেন কতদিনের পরিচিত। তাছাড়া ও আমাকে বাঙ্গালী বন্দীদের উদ্ধার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করছে। আমরা ওর কাছে কৃতজ্ঞ আচ্ছা এখন তুমি যাও, সব খেয়াল রেখে হুঁশিয়ারির সঙ্গে কাজ করবে। রামসিং গাড়িগুলোকে পরিচালনা করবে। প্রথম আমি আমির হোসেনের এক নম্বর বন্দী শিবিরের বন্দীদের মুক্ত করবো। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ.....

যাও, তোমরা হুঁশিয়ার থেকো।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

❑

গভীর রাত্রি।

শিয়রে একটানা টেলিফোন বেজে চলেছে।

ঘুম ভেংগে যায় আমির হোসেন নিয়াজীর।

দড়বড় বিছানায় উঠে বসে রিসিভার তুলে নেয় হাতে—হ্যালো স্পিকিং আমির হোসেন নিয়াজী। .....

ও পাশ থেকে ভেসে আসে তার একনম্বর বন্দীশিবির থেকে প্রধান শিবিররক্ষীর কণ্ঠস্বর.....মালিক আপনি এক্ষুণি চলে আসুন, আমাদের বিপদ ঘটেছে.....

নিয়াজীর নিদ্রাঘোর মুহূর্তে কেটে গেলো, বলে উঠলো..... বিপদ... বিপদ..... কি বিপদ.....

কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো উত্তর ভেসে এলো না।

নিয়াজী দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে নেমে পড়লো। কলিং বেলে চাপ দিতেই কক্ষের চারপাশ থেকে চারজন দেহরক্ষী ছুটে এলো। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

নিয়াজী নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতো, তাই সে নিজের শয়নকক্ষের চারপাশে চারজন দেহরক্ষী সদা-সর্বদা পাহারা রাখতো। ভয় ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ যদি তাকে হত্যা করে।

দোষী বা শয়তান লোকদেরই এমনি একটা ভীতিভাব থাকা স্বাভাবিক, নিয়াজীরও ছিলো। দেহরক্ষীরা ছুটে আসতেই নিয়াজী বললো—তোমরা আমাকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দাও। একনম্বর বন্দীশিবিরে যেতে হবে।

দেহরক্ষীদের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

হঠাৎ বন্দীশিবিরে কেনো মালিক? একজন দেহরক্ষী জিজ্ঞাসা করে বসলো।

নিয়াজী ব্যস্তকণ্ঠে বললো—কেনো বিপদ ঘটেছে সেখানে তাই যেতে হবে। তোমরা আমাকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দাও। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জামাটা পরে নিলো নিয়াজী। চাবির গোছাটা সঙ্গে নিতে ভুললো না সে।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে গাড়ি বারেন্দায় অপেক্ষা করছে। নিয়াজী নেমে আসতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

নিয়াজী চেপে বসলো গাড়িতে।

দেহরক্ষী চারজন লম্বা সেলুট ঠুকে দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়ি বেরিয়ে গেলো।

জনহীন রাজপথ।

উল্কাবেগে গাড়ি ছুটছে।

নিয়াজী বললো—এক নম্বর বন্দীশিবিরে চলো।

ড্রাইভার বললো—জ্বি হাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এক নম্বর বন্দীশিবিরের নিকটে পৌঁছে গেলো।

গাড়ি দরজায় পৌঁছলে নেমে পড়লো ড্রাইভার এবং সে নিজের হাতের গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

নিয়াজী সাহেব নেমে দরজার দিকে এগুলো।

বন্দীশিবিরের দরজা উন্মুক্ত দেখে বললো নিয়াজী—দরজা এমন খোলা কেন? দারোয়ান বেটা গেলো কোথায়?

ড্রাইভার ঠিক পিছনেই ছিলো, বললো—আপনি আসবেন বলে খোলা আছে। আর দারোয়ান বেটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে?

একটা অশুভ আশঙ্কায় মনটা দুলে উঠলো নিয়াজী সাহেবের, ঘেমে উঠছে সে ক্রমান্বয়ে। প্রায় একরকম ছুটেই চললো নিয়াজী সাহেব তার বিশাল বপু নিয়ে।

যতই এগুচ্ছে ততই হৃৎপিণ্ড তার ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। সমস্ত বন্দীশিবির পাহারাহীন। একজন পাহারাদারকেও তার নজরে পড়লো না, সব গেলো কোথায়! দু'একবার হোঁচট্ খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো সে। বন্দীশিবিরের দরজায় পৌঁছে দেখতে পেলো, দরজায় তালা ঝুলছে। কতকটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলো সে প্রাণে। যেমন সে ফিরে প্রধানরক্ষীর কক্ষের দিকে এগুতে যাবে অমনি ড্রাইভার বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল তার পিছন থেকে জামার কলারটা।

নিয়াজী চমকে পিছন ফিরতেই ড্রাইভার বলে উঠলো—কেউ নেই। আপনি কাউকেই খুঁজে পাবেন না। কোনো রকম চিৎকার করেও ভাল হবে না।

ড্রাইভার! নিয়াজী বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠলো।

ড্রাইভার নাকের তলা থেকে গোঁপজোড়া খুলে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ীটাও খুলে ফেলে সে।

নিয়াজীর দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠে, গলা শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। এ তো তার ড্রাইভার নয়, সুন্দর সুপুরুষ এক বলিষ্ঠ মুখ তার সম্মুখে ভেসে উঠে। নিয়াজী বলে উঠে—কে তুমি?

বললো ড্রাইভার—আমি একজন বাঙ্গালী! কথা শেষ হতে না হতেই নিয়াজীর বুকে চেপে ধরলো সে রিভলভার। কঠিন কণ্ঠে বললো—বন্দীখানার দরজা খুলে দাও।

ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছে নিয়াজীর মুখ, অমন একটা বিপদে পড়বে ভাবতেও পারেনি সে। নিয়াজীর দেহটা ঘেমে ভিজে চুপসে গেছে। ভীত দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগলো সে ড্রাইভারে হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে।

ড্রাইভার দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এক মুহূর্ত দেরী করো না, খুলে দাও বন্দীশিবিরে দরজা।

এবার নিয়াজী বাধ্য হলো বন্দীশিবিরে দরজা খুলে দিতে।

ড্রাইভার পকেট থেকে হুইসেল বের করে ফুঁদিতেই একজন এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার বললো—রামসিং, বন্দীদের নিয়ে যাও। তারপর বন্দীখানায় প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখলো তাতে তার মাথাটা আপনা আপনি নত হয়ে এলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বনহুর।

এই বন্দীশিবিরের ছিলো শুধু মহিলা।

এরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। পুরুষ লোক দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলো। দু'হাতে বুক ঢেকে ফেলেছে অনেকেই।

ড্রাইভার এবার বন্দিনী মহিলা ও তরুণীদের লক্ষ্য করে বললো—আপনারা এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসুন। বাইরে আপনাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে, আপনারা গিয়ে গাড়িতে বসুন। আজ আপনাদের আমি মুক্ত করতে এসেছি.....

ড্রাইভারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বন্দীশিবিরের মালিক আমির হোসেন নিয়াজী। ড্রাইভারের কথাগুলো তার কানে পৌঁছতেই তার মুখখানা হিংস্র

জন্তুর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। কিন্তু ড্রাইভারের হাতের রিভলভারখানার জন্য সে কিছু বলতে সাহসী হচ্ছে না।

প্রথমে বন্দী মহিলারা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না তারা ওদের কথাগুলো। কারণ তারা জানে, ঐ ভয়ঙ্কর চেহারার নিয়াজী সর্দার কত সাংঘাতিক লোক। ও প্রতিরাতে এই বন্দীশিবিরে এসে কত নারীকে নিয়ে গেছে এবং তার উপরে চালিয়েছে পাশবিক নির্যাতন। যখন তাকে এই বন্দীশিবিরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তখন তার অবস্থা অবর্ণনীয়। আজও তাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য ভাব নিয়ে তাকায় ওরা ড্রাইভার ও পাশে দাঁড়ানো নিয়াজীর মুখের দিকে। অল্পক্ষণেই মহিলারা বুঝতে পারে নিয়াজী এক্ষণে পিয়াজী বনে গেছে, কারণ একটা কথা বলতে পারছে না, তাছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে উদ্যত রিভলভার—নিশ্চয়ই সে নিয়াজীকে কাবু করে ফেলেছে।

ড্রাইভার পুনরায় বললো—আপনারা বিলম্ব করবেন না—শীঘ্র বেরিয়ে পড়ুন। বাইরে আপনাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।

এবার মহিলাগণ লজ্জা শরম ভুলে যে যেমন ছিলো তেমনি জলস্রোতের মত হু হু করে বেরিয়ে এলো বন্দীশিবির থেকে।

বাইরে অপেক্ষা করছিলো কয়েকখানা গাড়ি।

রামসিং সেই গাড়িগুলোতে মহিলাদের তুলে নিলো।

ওদিকে আমির হোসেন নিয়াজীসহ ড্রাইভার নিয়াজীর গাড়িতে উঠে বসলো। ড্রাইভার রামসিংকে বললো—তোমরা ঠিকমত বন্দী মহিলাদের জাহাজে তুলে দিয়ে গাড়ি দু'নম্বর বন্দী শিবিরে নিয়ে আসবে, আমি নিয়াজী সাহেবসহ সেখানে অপেক্ষা করবো।

রামসিং সেলুট দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো এবার। নিয়াজীর মুখে কোনো কথা নেই। সে যেন বোবা বনে গেছে। সে ভাবতেও পারেনি শিয়ালকোটে এমন কেউ আছে যে তাকে কাবু করতে পারে। তাকে কৌশলে বাড়ি থেকে বের করাটাও কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আমির হোসেন নিয়াজী নিজের কানে শুনেছে তার একনম্বর বন্দীশিবির থেকে প্রধান রক্ষীর ভীত কণ্ঠস্বর। তাকে

শীঘ্র চলে আসার জন্য বলেছিলো সে, বলেছিলো বিপদে পড়েছে। কিন্তু এসে তার সাক্ষাৎ পায়নি, সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ লোকটাকে যে তাকে তারই নিজস্ব ড্রাইভারের বেশে গভীর রাতে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে। উদ্দেশ্য তারই দ্বারায় বন্দীদের মুক্ত করা এটাও নিয়াজী বুঝে নেয় ভালভাবে। নিয়াজী আরও বুঝে নিয়েছে, কোনো রকম প্রতিবাদ করে কোনো ফল হবে না। ড্রাইভার যেই হোক সে কম লোক নয়, আরও একটি ভয় তার হাতে রিভলভারখানা। আর সেই কারণেই নিয়াজী ঠিক পিয়াজী বড়ার মত মুখ চুপসে বসে ছিলো। অবশ্য তার মাথার মধ্যে নানা রকম মতলব উঁকি দিচ্ছিলো, কেমন করে এই লোকটাকে কাহিল করে পালাবে সে।

কিন্তু পালানো তার হলোনা, নিয়াজীর দু'নম্বর বন্দীশিবিরে গিয়ে হাজির হলো গাড়িখানা।

ড্রাইভার রিভলভার তুলে নিলো হাতে তারপর বললো—নেমে পড়ুন মিঃ নিয়াজী।

নিয়াজী নেমে পড়তে বাধ্য হলো।

এটা নিয়াজী সাহেবের দু'নম্বর বন্দীশিবির।

ড্রাইভার নিয়াজীসহ বন্দীশিবিরে প্রবেশ করলো। নিয়াজীর চোখেমুখে ভয়-বিস্ময়, চারিদিকে তাকাতে লাগলো সে ফ্যাল ফ্যাল করে। এখানেও প্রথম বন্দীশিবিরের মতই অবস্থা কোথাও কোনো পাহারাদার নেই একটি লোকও নেই, তার কর্মচারীদের মধ্যে।

ড্রাইভার বললো—চলুন ভিতরে চলুন।

কম্পিত পদক্ষেপে এগুলো নিয়াজী।

বন্দীশিবিরের তালা খুলে দিলো নিয়াজী নিজের হাতে।

ড্রাইভার বন্দীদের বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানালো।

বন্দীশিবিরের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। বাঙ্গালী বন্দী নারী-পুরুষ সবাই উন্মাদের মত মরিয়া হয়ে ছুটো-ছুটি করে গাড়িতে এসে উঠে পড়লো। মুক্তির আনন্দে সবাই যেন দিশেহারা।

❑

শিয়ালকোটের ধনকুবের আমির হোসেন নিয়াজীর লাশ গেলো লাহোরের সবচেয়ে বড় মিউজিয়ামের এক উল্লেখিত জায়গায়। মৃতদেহটির গলায় ঝুলছে একটি। কাগজের টুকরা। তাতে লিখা আছে "বাঙ্গালী নির্যাতনকারীর উপুক্ত সাজা" মৃত নিয়াজীর দেহের চামড়া সরু ছুরি দ্বারা চিরে চিরে ফেলা হয়েছে। চোখের মধ্যে দুটি লৌহ শলাকা প্রবেশ করানো রয়েছে। লৌহশলাকা দুটি দেখলে মনে হয় এক সময় শলাকা দুটি অগ্নিদগ্ধ ছিলো। চোখের চারপাশ পুড়ে সাদা হয়ে গেছে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখখানা। নিয়াজীকে যে চরম শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা তার মৃতদেহ দেখলেই বোঝা যায়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, লাশটি কি করে লাহোর মিউজিয়ামে গেলো? কার এমন সাহস এমন দুঃসাধ্য কাজ করে। সমস্ত লাহোরে এ ব্যাপার নিয়ে ভিষণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পত্রিকায় ছাপা হয় এ ঘটনাটি নানা ভাবে।

বনহুর তার ক্যাবিনে বসে দৈনিক পত্রিকাখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। পত্রিকাখানা বাংলা বা উর্দূ নয়, ইংরেজী সংবাদ পত্র।

বনহুর যখন পত্রিকায় দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে তখন শাম্মী এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

চোখ তোলে বনহুর—শাম্মী!

হাঁ মিঃ লিয়ন।

এ ক'দিন কোথায় ছিলে শাম্মী?

মালিকের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলাম, কারণ.....

কারণ আমাকে বলতে হবে না শাম্মী, আমি সব জানি এবং সেজন্য তোমাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ।

শাম্মী বনহুরের পাশে বসে পড়লো। আজ তাকে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি খুশি মনে হচ্ছে। সুন্দর গোলাপী ড্রেসে অপূর্ব লাগছে।

বনহুর মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে শাম্মীর মুখের দিকে। এক সময় শাম্মীর হাতখানা তুলে নিলো বনহুর নিজের হাতের মুঠায়। গভীর আবেগে

বললো—শাম্মী, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ.....তোমার সহায়তা না পেলে আমি হয়তো মৃত্যুমুখী এতোগুলো বাঙ্গালী বন্দীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম না।

শাম্মী বললো—মিঃ লিয়ন, আপনাকে সাহায্য করতে পেরে সত্যি আমি নিজেও আনন্দিত। শাম্মী অতি সংযতভাবে কথাটা বলে নিজের হাতখানা বনহুরের হাতের মধ্য থেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো—আজকের মত চলি।

বনহুর কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বেরিয়ে যায় শাম্মী।

বনহুরের মুখে মৃদু একটা হাসির আভাস ফুটে উঠে। সংবাদপত্রখানা হাতে তুলে নেয় সে পুনরায়। মনে তার নানা চিন্তার উদয় হতে থাকে। আশ্চর্য মেয়ে শাম্মী। একে যত দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে বনহুর। অবাঙ্গালী হয়েও তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর বাঙ্গালী দরদী মনোভাব। তাছাড়াও শাম্মীর মধ্যে বনহুর এক নতুন নারীকে আবিষ্কার করেছে। তার রূপ-যৌবন সব তো এই হোটেলবাসীদের জন্য, কিন্তু বনহুরের কাছে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। বনহুর অনেক পরীক্ষা করেও শাম্মীর চরিত্রে অসংযত কোন লক্ষণ সে দেখতে পায়নি। সে দেখেছে এক পবিত্র নারী প্রাণ।

শাম্মীকে বনহুর তাই ঘৃণা করতে পারেনি বরং একটা অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করেছে সে নিজের মনে।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, পিছন ফিরতেই দেখতে পায়, সমস্ত শরীরে সাদা ধবধবে আলখেল্লা পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'হাতে দু'টি পিস্তল।

পরবর্তী বই

যমদূত ও দস্যু বনহুর